প্রথম প্রকাশ : শ্রাবণ ১৩৬৭, জুলাই ১৯৬০

প্রকাশক : নেপালচন্দ্র ঘোষ
সাহিত্যলোক, ৩২/৭ বিডন স্ট্রীট, কলকাতা ৬

মুদ্রাকর : নেপালচন্দ্র ঘোষ
বঙ্গবাণী প্রিণ্টার্স, ৫২ এ কারবালা ট্যাঙ্ক লেন, কলকাতা ৬

ভূমিকা

আমাদের দেশের কৃষ্টির ধারাবাহিকতা ও জীবনবোধ সমগ্র পৃথিবীর মানুষের সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। শিল্পকলা বা কারুকৃতি মাত্রেরই একটি সামাজিক পটভূমিকা ও তাৎপর্য বর্তমান, শিল্পনিদর্শনের মাধ্যমেই আমরা কোন একটি দেশের চিন্তা-ভাবনাকে উপলব্ধি করার প্রয়াস করতে পারি। ভারতবর্ষের সুদীর্ঘ ইতিহাসে এবং বিস্তীর্ণ ভৌগোলিক পরিধিতে যে বিচিত্র ও ঐশ্বর্যময় কলাসৃষ্টি যুগে যুগান্তরে মানুষের যাত্রাপথকে আলোকিত করেছে তার সম্যক বিবরণ রচনার ক্ষেত্রের ও পরিপ্রেক্ষিতের বিশালতাকে আমরা কোনক্রমেই অস্বীকার করতে পারি না। কয়েকটি ক্ষুদ্রাকার নিবন্ধসমষ্টির দ্বারা এই মহান শিল্পক্ষেত্রের প্রতি যথার্থ সুবিচার করা যায় না। এমতাবস্থায় আমরা আমাদের আলোচনাকে ভারত-প্রাচ্য অর্থাৎ পূর্ব-ভারতের শিল্পকলার জন্য বিশেষভাবে চিহ্নিত করার প্রচেষ্টা করেছি।

ভারতীয় উপ-মহাদেশের পূর্বাঞ্চল একাধিক কারণে তার সুমহান ঐতিহ্যমণ্ডিত শিল্পধারা ও শিল্পধারণাকে বহুদূরব্যাপী কালস্রোতে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হয়েছিল। এই অভূতপূর্ব সাংস্কৃতিক জয়যাত্রার স্বাক্ষর বহন করেছে পূর্বভারতের বিশিষ্ট শিল্পকলা। পূর্বভারতের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে সুবর্ধিত শিল্পরীতিই আবার অনুকূল পরিবেশে সাগর-কান্তারের বাধাকে অতিক্রম করে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নানাদেশে ভারতীয় রূপাদর্শ ও শিল্পবোধকে প্রসারিত করে দিয়েছিল। অতএব আমাদের আলোচনাক্রমে বহির্ভারতের উল্লেখ কোনক্রমেই অবাঞ্ছিত নয়, এমনকি, অনেকক্ষেত্রে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার শিল্পকৃতির আলোকে পূর্বভারতের শিল্প-অবদানকে ঘনিষ্ঠতর ও গভীরতরভাবে অনুধাবন করা যেতে পারে।

ভূমিকা

ভারতীয় প্রথা ও ঐতিহ্যানুসারী শিল্পধারাকে লোকশিল্প, সুকুমার-কলা, কারুশিল্প, আলঙ্কারিক শিল্পকৃতি এই সমস্ত কৃত্রিম ও য়ুরোপীয় উৎস থেকে আনয়ন করা শ্রেণীবিভাজনে ন্যস্ত করা যায় না। আমাদের দেশে দেখা যায় যে লোকশিল্পের আঙ্গিক, বক্তব্য ও প্রকাশরীতি যেন সুপ্রাচীন প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে বর্তমান যুগেও চলে এসেছে। বঙ্গীয় লোককলার রেখাপাত, এবং তার বৃক্ষলতাপুষ্প ও প্রাণিকুলের রূপায়ণ সবই যেন সুদূর অতীতের হরপ্পীয় মৃৎপাত্রালঙ্কারে ধরা আছে। ময়ূরের রূপায়ণ ধরা আছে অতি প্রাচীন মৃৎকৌলালে, পোড়ামাটিতে করা ঐতিহাসিক যুগের মুদ্রাঙ্কনে আর একেবারে ঘরোয়াভাবে নিপুণ-হাতে তৈরি গৃহস্থবাড়ির কাঁথাতে।

ঐতিহাসিক যুগের শিল্পকলার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্নবিদ্যা ও প্রত্নক্ষেত্র-অনুসন্ধানের একটা বিশেষ যোগ আছে। অনেক সময়েই প্রত্নক্ষেত্রের কৃষ্টিমূলক সম্ভাবনার কথা বহুবৎসরব্যাপী নিরবচ্ছিন্ন অন্বেষণের ফলে লব্ধ প্রত্ননিদর্শনের সাহায্যে যথাযোগ্য স্বীকৃতিলাভ করে থাকে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ মিউজিয়মের কর্মীদের উদ্যোগে বহুদিনব্যাপী ধারাবাহিক প্রয়াসের ফলেই নিম্নগাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের প্রত্নসম্পদের সাংস্কৃতিক গুরুত্ব আজ সুপ্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে। এই-রকম একটি পূর্বে অবহেলিত অঞ্চলের প্রত্ন-শিল্পকলাকে কয়েকটি উল্লেখ্য নিদর্শনের মাধ্যমে প্রকাশ করার উদ্দেশ্য নিয়ে দুইটি প্রবন্ধ এই সংকলনে যুক্ত হয়েছে। পূর্বভারতের শিল্পপ্রয়াসে উড়িষ্যার অতি মূল্যবান অবদানকে আমরা কোনক্রমেই বিস্মৃত হতে পারি না। জনজীবনের গভীর সম্পর্কে যুক্ত থেকেছে উড়িষ্যার শিল্পরীতি; এতে দক্ষিণ ভারতের সঙ্গে উত্তর-ভারতীয় শিল্প-প্রয়াসের মিলন হয়েছে। চিত্রকলায় উড়িষ্যার অবদানকে কালজ ও দেশজ প্রকাশভঙ্গীতে পূর্ব-গাঙ্গেয় সমতল-ভূমির চিত্রধারার সঙ্গে অন্ধ্র তথা দক্ষিণদেশের সঙ্গে যোগাযোগ রচনার সেতুরূপে প্রতিভাত করাই অন্য আর একটি আলোচনার মূল বক্তব্য।

উড়িষ্যার চিত্রপারঙ্গম মনন ও কারুকৃতির কাহিনী স্বাভাবিক পরিণতিতে এসে পড়েছে বাঙলার চিত্রপটের আলোচনায়। হিন্দী রামচরিত মানসের পুঁথিতে থাকা বঙ্গীয় তথা মেদিনীপুরের লোকচিত্র-দক্ষ শিল্পীর সুপ্রচুর চিত্রনিদর্শনের সংগ্রহে। সযত্ন প্রয়াসে চিত্ররীতির উপস্থাপনা, বর্ণ পরিকল্পনা, রেখাপাত এবং রূপায়ণের সামগ্রিক বিশ্লেষণ করে দেখা যাচ্ছে যে এই রীতির সঙ্গে বঙ্গীয় জড়ানো পটের চিত্রাবলীর মধ্যে একটা গভীর ও অন্তরস্থিত সংযোগ আছে। উপরন্তু এই সংযোগই প্রমাণ করেছে যে বাঙলার অন্ত্য-মধ্যযুগের চিত্রকলা কোনক্রমেই একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনামাত্র নয়। মধ্যযুগের চিত্র ও পরবর্তী লোকচিত্রও বাঙলার মননকে একই ধারাবাহিকতার অনুসারী করেছে। এর পরে আলোচনা ক্রমশ প্রসারিত হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে লোকচিত্রের বিভিন্ন আঞ্চলিক ধারাবিবরণীতে। পটের কথায় এসেছে পটুয়ার কথা। পটুয়ার করা ক্রমিকভাবে উপর থেকে নীচে চতুষ্কোণাকার পরিসীমায় রক্ষিত লোককাহিনী তার মধ্যে বহন করে চলেছে অতিপ্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত বর্ণনামূলক চিত্রকথাকে দৃশ্যযোগ্য মাধ্যমে প্রকাশ করার অপূর্ব প্রাণবন্ত ক্ষমতায় স্পন্দিত শিল্পকর্মে।

সম্ভ্রান্ত সমাজের প্রত্যন্তে, প্রভাব-প্রতিপত্তিতে নিমজ্জমান নাগর জীবনযাত্রার ক্ষণস্থায়ী দৃশ্যপট পরিবর্তনকে অস্বীকার করে যে প্রাণবন্ত শিল্পধারা ভারতের শিল্পক্ষেত্রে সর্বকালে ও সর্বযুগে বলিষ্ঠ মানবিকতার উৎসস্বরূপ হয়ে বিরাজ করছে সেই আদিম জনগোষ্ঠীর কারুকৃতি ও শিল্পসাধনা আজও নানাভাবে প্রকাশিত হয়ে চলেছে। পূর্ব-ভারতের আদিবাসী জনকৃতির ধাতব কলা এই অবহেলিত উৎস সম্পর্কে আমাদের সচেতন করে তুলতে পারে। সদা ভ্রাম্যমাণ এই পর্যায়ের শিল্পী সমাজ প্রাগৈতিহাস-ইতিহাসের প্রত্যূষে পূর্ব ও মধ্যভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে রেখে গেছে সরল বলিষ্ঠতায় ভরা এবং বাঁশ-বেতের বুননের দ্বারা অনুপ্রাণিত ভূষণালঙ্কারে সজ্জিত ধাতব ভাস্কর্য নিদর্শন।

বৃহত্তর ভারত, ভারতের রাজনৈতিক উপনিবেশ নয়। ভারতের কৃষ্টি

ও জীবনাদর্শে অনুপ্রাণিত জনজীবনের স্থানীয় প্রতিভায় উদ্ভাবিত ও উদ্ভাসিত প্রতিফলন। পূর্বভারতের শিল্প-প্রেরণার তরঙ্গ নানা পর্যায়ে ও পরিবৃত্তে মালয়, ইন্দোনেশিয়া, বোর্ণিও, ইন্দোচীন, শ্যামদেশ, ফিলিপাইন, ব্রহ্ম ও নেপালে এবং মধ্যএশিয়ার তিব্বত প্রভৃতি দেশে ও তার চারপাশের অঞ্চলসমূহে আপন প্রতিভা ও সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের স্বাক্ষর রেখে গেছে। আজও এই স্বাক্ষর ও ভাববিনিময়ের শিল্প-নিদর্শন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় নানাভাবে পরিদৃশ্যমান। পশ্চিমভারতের সঙ্গে বহির্বিশ্বের যোগাযোগ নিয়ে একাধিক আলোচনা হলেও পূর্বভারতের সঙ্গে বহির্ভারতের যোগাযোগের কথা অপেক্ষাকৃত অবহেলিত; উপরন্তু বাঙলা তথা পূর্বভারতের সংস্কৃতি-সম্পৃক্ত মধ্য এশিয়া, তিব্বত, দূরপ্রাচ্য ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার পরিমণ্ডল ও বিস্তৃতির ইতিহাস রচনায় যাঁরা জীবনব্যাপী কর্মোদ্যমকে নিয়োজিত করেছিলেন তাঁদের বার বার স্মরণ করা আমাদের অবশ্যপালনীয় জাতীয় কর্তব্য। ভারতের সুদীর্ঘ পূর্ব সমুদ্রতটের পরপারের সাংস্কৃতিক অগ্রগতির কথায় এবং বিশেষভাবে ইন্দোনেশিযার ভাষা, সাহিত্য, লোকাচার ও শিল্পসৃষ্টিতে ভারতীয়ত্ব ও ভারতমুখীন ভাবধারার প্রাথমিক পর্যালোচনা আমি তাই সঙ্গত কারণেই এই ক্ষুদ্র গ্রন্থের মধ্যে গ্রথিত করার অনুপ্রেরণা লাভ করেছি।

আমার জীবনের সুদীর্ঘ কর্মকালে প্রায় অর্ধশতাব্দীর অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয়ে আছে। বাঙলা ও উড়িষ্যার শিল্পকলা তথা পূর্বভারতের সুকুমারকলা ও কারুকৃতির বন্দনা দিয়েই এই প্রয়াসের সূচনা হয়েছিল। কর্মোদ্যোগের প্রাথমিক পর্যায় থেকে এই সত্যটিই প্রতিভাত হয়েছিল যে মূল শিল্পনিদর্শন সংগ্রহের সঙ্গে সম্যক পরিচয় না হলে শিল্পের প্রকৃতি আঙ্গিক ও নান্দনিক তাৎপর্য সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করা যাবে না। এই প্রত্যয়টি আমাকে জীবনব্যাপী প্রয়াসে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'আশুতোষ মিউজিয়ম' বা 'আশুতোষ মিউজিয়ম অব্ ইণ্ডিয়ান আর্ট' গড়ে তুলতে অনুপ্রেরণা দিয়েছে। সুদীর্ঘকাল আমার কেটেছে পূর্বভারত তথা উড়িষ্যা, দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গ ও উত্তরবঙ্গের প্রত্নক্ষেত্রে এবং

লোককলা কেন্দ্রসমূহ থেকে শিল্পনিদর্শন সংগ্রহে। আমার সাধ্যমত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, গবেষক, মিউজিয়ম কর্মচারী ও পরিণতবুদ্ধি ছাত্রসাধারণের ঐকান্তিক সহযোগিতায় ক্রমে ক্রমে আশুতোষ মিউজিয়ম বঙ্গীয় শিল্পকলার সর্বাগ্রগণ্য সংগ্রহে পরিণত হয়েছে। এছাড়া আশুতোষ সংগ্রহশালা বিভিন্নভাবে ভারতের বাহিরে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে একাধিক সুবিখ্যাত প্রদর্শনীর মাধ্যমে মূল শিল্পনিদর্শনের সাহায্যে পূর্বভারতের অবদানকে আজ সুপ্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছে। পূর্বভারতের লোকশিল্পসম্পদের সমীক্ষা আশুতোষ সংগ্রহশালায় আমার উদ্যোগে ও ব্যবস্থাপনায় একদিকে শিল্পসম্পদকে সমৃদ্ধ করেছে ও এই সম্পর্কে আলোচনার সূত্রপাতের অবকাশ সৃষ্টি করে দিয়েছে। প্রাচ্যভারত থেকে প্রাচ্য এশিয়ার ভারত-অনুপ্রাণিত শিল্পধারার অধ্যয়ন ও পঠন-পাঠন ও প্রশিক্ষণের সঙ্গে আমি যুক্ত থেকেছি বহুদিন ধরে। নানান বৎসরের ছাত্র-ছাত্রীদের প্রীতিস্নিগ্ধ সান্নিধ্য আমাকে আজ এই ক্ষুদ্র পুস্তক রচনায় উৎসাহিত করেছে।

সংগ্রহশালা কেবলমাত্র সংগ্রাহকের খামখেয়াল নয়। সংগ্রহশালা শিল্পের মাধ্যমে দেশের অপরাজেয় আত্মার ও দেশের মানুষের হৃদয়াবেগের দ্বারা উদ্দীপিত শিল্পরচনার পর্যালোচনার ও সম্যকভাবে শিল্প-রসাস্বাদনের জাতীয় কেন্দ্র। প্রকৃত সংগ্রাহক কেবলমাত্র ব্যক্তিগত উপভোগের জন্য শিল্পসংগ্রহ গড়ে তোলেন না। যথার্থ সংগ্রহশালা-কর্মীর জীবন সকলের সাথে দেশের শিল্পপ্রতিভার সমাদর ও জাতীয় চেতনার উন্মেষের উদ্যমের সঙ্গে প্রতি পদক্ষেপে ছড়িয়ে আছে।

অনেক সময়েই আমাদের দেশের জীবনে বিভিন্ন প্রকারের বিপর্যয় নেমে এসেছে। সাময়িকভাবে আমরা হয়ত পড়েছি হতাশ হয়ে। এই হতাশাকে অতিক্রম করার যে-সমস্ত পথ আছে, দেশের শিল্পকীর্তির দিকে সশ্রদ্ধভাবে নিজেদের দৃষ্টিকে গভীরভাবে ফিরিয়ে দেবার প্রচেষ্টা তার মধ্যে অন্যতম। এই নিবন্ধসংগ্রহের রচনাগুলি বহুদিন ধরে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার আবরণে আবদ্ধ হয়েছিল লোকচক্ষুর অন্তরালে।

ভূমিকা

আমার স্নেহভাজন ছাত্রদের ঐকান্তিক ইচ্ছায় এইগুলি আবার জনসমক্ষে প্রচারিত হবার সুযোগ উপস্থিত হয়েছে। এই প্রবন্ধগুলির বক্তব্য ও সারাংশ আমার জীবনযাত্রার সম্যক অভিজ্ঞতায় সৃষ্ট বলেই এইগুলি প্রকাশনের জন্য আমি উৎসাহিত হয়েছি।

আমি একান্তভাবে কামনা করি যে আগামী দিনগুলিতে বাঙলার শিল্পকলার পর্যালোচনায় ক্রমশ নব নব দৃষ্টিভঙ্গীর আলোকপাত ঘটবে। যদি আমার প্রবন্ধাবলী বঙ্গভাষার পাঠককে অবহেলিত প্রাচ্যভারতের প্রত্নক্ষেত্রে অভিযানের উৎসাহ যোগায়, যদি নবীন শিল্পরসিক পূর্বভারতের ও ভারত-প্রভাবিত প্রাচ্যদেশের সংগ্রহশালার কক্ষে কক্ষে পরিভ্রমণের উৎসাহ দান করে এবং পূর্বভারতের গ্রামীণ লোকশিল্প ও লোকশিল্পীর প্রতি সশ্রদ্ধ বন্দনার মনোভাব আনয়ন করে দেয় ও প্রত্নশিল্পসম্পদ রক্ষণের উদ্যোগগ্রহণে অনুপ্রাণিত করে তবে এই পুস্তকের প্রকাশনাকে সার্থক বলে মেনে নিতে আমার কোন বাধা থাকবে না।

পূর্বভারতের শিল্পকলার বিভিন্ন দিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রমাপ্রসাদ চন্দ, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, দীনেশচন্দ্র সেন, নলিনীকান্ত ভট্টশালী, জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, গুরুসদয় দত্ত, কালিদাস দত্ত, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি পথিকৃৎদের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠালাভ করেছে, সাহায্য ও নান্দনিক অনুপ্রেরণা এসেছে অবনীন্দ্রনাথ ও নন্দলালের শিল্পসৃষ্টিতে ও রসবোধে এবং শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের প্রত্যক্ষ উৎসাহে। আশুতোষ মিউজিয়ম পরিচালনার প্রতি পদক্ষেপে সহযোগিতা লাভ করেছি আমার শিক্ষাজগতের সমসাময়িক শিল্পবেত্তা নীহাররঞ্জন রায় ও সরসীকুমার সরস্বতী প্রমুখ অধ্যাপকবৃন্দের নিকট থেকে। আমার ছাত্রদের ও ছাত্রস্থানীয়দের মধ্যে কল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, অক্লান্তকর্মী সুধাংশুকুমার রায় ও অতুলনীয় প্রত্ননিদর্শন-সংগ্রাহক পরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত এবং আশুতোষ মিউজিয়মের শিল্পী প্রাণকৃষ্ণ পাল বঙ্গীয় শিল্পকলার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন আর

আশুতোষ সংগ্রহশালার সংগ্রহকে বৈচিত্র্যে ও নানা দিকের নিদর্শনের দ্বারা সমৃদ্ধ করে দিয়েছেন। আমার কর্মজীবনে আমি দেখেছি কিভাবে জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভারতীয় প্রতিমাতত্ত্বের কাজ, সরসীকুমারের বাঙলার ভাস্কর্যকৃতির মূল্যায়ন, নীহাররঞ্জনের পূর্বভারতীয় শিল্পকলা-সূচক বক্তব্য আশুতোষ মিউজিয়মের শিল্প-নিদর্শনের দ্বারা অনুশীলিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে আজ আমার আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সর্বাঙ্গীন উৎসাহদান ও ইন্দোনেশীয় চিত্রকলার নিদর্শন প্রভৃতি উপহারদানের কথা মনে আসে। আচার্য সুনীতিকুমার প্রত্যক্ষভাবে শিল্পকলার গবেষক না হয়েও ভারতীয় তথা পূর্ব ও বৃহত্তর ভারতীয় শিল্প সম্পর্কে ও সংগ্রহশালা নিয়ে যে বিদগ্ধ আগ্রহ পোষণ করতেন সেটিকে আমি সর্বতোভাবে অনুসরণ-যোগ্য বলে মনে করি। শিল্পচেতনা জাতীয় চেতনারই এক অমোঘ ও অকৃত্রিম উপাদান। শিল্পবোধশূন্যতা পূর্ণাঙ্গ মনোবিকাশের অন্তরায় ও অমানবিক যান্ত্রিকতার বিষাক্ত স্রোতোধারায় জাতীয় জীবনকে হতাশা-গ্রস্ত ও উদ্দেশ্যবিহীন আড়ম্বরে বিড়ম্বিত করে। রসবোধহীন, নির্দয় ও স্বার্থপর ব্যক্তিকেন্দ্রিকতাকে আমাদের সহৃদয় শিল্পবোধে ঐশ্বর্যবান চেতনার দ্বারা পরাভূত করতে হবে।

আমার কর্মজীবন বিভিন্ন পর্যায়ে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতির চর্চায়, সংগ্রহশালায় শিল্প-শিক্ষকদের ললিতকলার নান্দনিক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনায় এবং পূর্বভারতে সংগ্রহশালাবিজ্ঞানের স্নাত-কোত্তর শিক্ষাদানে অতিবাহিত হয়েছে। আশুতোষ সংগ্রহশালার যে সমস্ত সহকর্মী আমাকে গ্রাম-গ্রামান্তর থেকে শিল্পদ্রব্য সংগ্রহ করে দিয়েছেন, যে ছাত্র-ছাত্রীরা ভারতের নানাস্থানে, বিশেষ করে পূর্বভারতের প্রত্নক্ষেত্রে, লোককলাকেন্দ্রে ও সংগ্রহশালাসমূহে কাজ করে যাচ্ছেন, যাঁরা উত্তরজীবনে শিল্প-ইতিহাস-শিক্ষণের গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করেছেন, এঁদের সকলেরই উৎসাহ, উদ্দীপনা এই প্রবন্ধ-কয়টির গ্রন্থনের কাজটিকে সফল করেছে। আমার ঐকান্তিক কামনা যে বাঙলার ও পূর্বভারতের

ভূমিকা

ঐতিহ্যানুসারী শিল্পধারাকে বাঙলার শিল্পীকুল ও শিল্পরসিক সাধারণ মানুষ সযত্নে রক্ষা করে যাবেন।

সহধর্মিণী শ্রীযুক্তা অঞ্জলি ঘোষ, বি.এ. এবং কন্যা শ্রীমতী জয়তী ঘোষ, বি.এ.—এঁদের আমি আমার আন্তরিক প্রীতি ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। এঁদের নিরবচ্ছিন্ন ও প্রত্যাশাহীন সাহায্য ছাড়া হয়ত এই গ্রন্থের প্রবন্ধাবলী লেখার কাজ সম্পূর্ণ হয়ে উঠত না।

শ্রীযুক্ত নেপালচন্দ্র ঘোষ আমার প্রবন্ধাবলীকে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। আশা করি, তাঁর শিল্প-কলা বিষয়ে পুস্তক প্রকাশনের উৎসাহ ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।

আমার কর্মজীবনের সমস্ত প্রয়াস ও আনন্দ আশুতোষ সংগ্রহ-শালার সঙ্গে বিজড়িত। আজ তাই প্রসন্ন চিত্তে আমার জীবন সায়াহ্নের এই গ্রন্থের জন্য আশুতোষ সংগ্রহশালা তথা মাতৃস্বরূপা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যে চিত্রসম্ভার ব্যবহার করতে অনুমতি দিয়েছেন তার জন্য ও এই পুস্তকে সন্নিবিষ্ট প্রবন্ধাবলীর জন্য আমি সংশ্লিষ্ট পত্রিকাদির কাছে অকুণ্ঠ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

সর্বপ্রকার সতর্কতা সত্ত্বেও দুইটি মুদ্রণপ্রমাদ এই প্রথম প্রয়াস-মূলক গ্রন্থে চোখে পড়েছে। গ্রন্থের প্রথম পৃষ্ঠায় 'পালিমজ্ঝ' স্থলে 'পাণিমজ্ঝ' এবং একান্ন পৃষ্ঠায় 'মজ্ঝানিপুত্ত'-এর পরিবর্তে 'মজ্ঝলিপুত্ত' পাঠ করতে হবে সহৃদয় পাঠককে।

আমার একান্ত স্নেহভাজন ও অনুগত ছাত্র শ্রীমান সন্তোষকুমার বসু এই পুস্তক প্রকাশনের বিভিন্ন পর্যায়ে একনিষ্ঠভাবে যে সাহায্য করেছে, সেটিকে আমি তার শিল্প ও সংগ্রহশালা-প্রীতির এবং শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসার ঐকান্তিক নিদর্শনরূপে গণ্য করেছি। আমি আন্তরিকভাবে কামনা করি যেন তার প্রিয় বিষয়সমূহের চর্চায় সে সর্বতোভাবে নিয়োজিত হতে সমর্থ হয়।

দেবপ্রসাদ ঘোষ

চিত্রসূচী

১০ উড়িষ্যার নৃপতি মুকুন্দ হরিচন্দন (?) কর্তৃক আকবরের নিকট হইতে আগত দূতকে সাক্ষাৎকার প্রদান, কার্পাসবস্ত্রখণ্ড-সংলগ্ন কাগজে অঙ্কিত বর্ণাঢ্য চিত্রনিদর্শন, রণপুর, উড়িষ্যা, আনুমানিক খৃস্টীয় ষোড়শ শতকের মধ্যকালীন।

১১ অশোকবনে রাম ও সীতার সাক্ষাৎকার, তুলসীদাস-কৃত 'রাম-চরিত মানস', কাগজে অঙ্কিত হস্তলিখিত পুঁথি, মহিষাদল, মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, ১৭৭২ খৃস্টাব্দ।

১২ কৃষ্ণলীলা পট, কাগজে অঙ্কিত, মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, আনু-মানিক অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধ।

১৩ বোরোবুদুরের পাদমূলস্থিত একটি ধ্যানীবুদ্ধ, মধ্য-যবদ্বীপ, ইন্দোনেশিয়া, খৃস্টীয় অষ্টম শতক। (লেখক কর্তৃক গৃহীত আলোকচিত্র, পূর্বে অপ্রকাশিত)

প্রদত্ত শিল্পনিদর্শনাদির চিত্র আশুতোষ সংগ্রহশালার সৌজন্যে ং প্রদত্ত প্রবন্ধাবলী 'মৈত্রী', 'অন্যমনে', 'বেতার জগৎ', 'সারস্বত', 'দেশ' প্রভৃতি পত্রিকাদির সৌজন্যে ব্যবহৃত।

প্রবন্ধ-সূচী

প্রথম পর্যায়

দ্বিতীয় পর্যায়

হরপ্পা যুগের চারুকলা ও বাংলার লোকশিল্প

বাংলার লোকশিল্প আজ অবহেলিত ও প্রায় অবলুপ্ত। কিন্তু আশার বিষয় বাংলার নানা চিত্রশালা ও সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান জনসাধারণের মধ্যে এই লোকশিল্পের ঐশ্বর্য ও মূল্যায়ন সম্বন্ধে আগ্রহ জাগাবার জন্য সচেতন হয়ে ঐকান্তিক ভাবে চেষ্টা করছেন, সাময়িক প্রদর্শনী ও আলোচনাচক্রের মাধ্যমে।

কিন্তু বাংলার তথা ভারতীয় লোকশিল্পের যথার্থ মূল্যায়ন করবার আগে জানা চাই তাদের মূল উৎস কোথায় এবং কতদিন ধরে এই লৌকিক ধারা প্রবহমান। জনসাধারণের মধ্যে একটা ধারণা আছে যে লোকশিল্পের নানা ভঙ্গিমা ও প্রকাশ মাধুর্য মোটামুটি অতি আধুনিক কালের একশো দেড়শো বছরের বেশী নয়। এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। কিছুদিন পূর্বে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ আয়োজিত বাংলার পট আলোচনাচক্র উদ্বোধন করতে গিয়ে বলেছিলাম বিশদভাবে, ভারতীয় লোকশিল্পের আবহমান ঐতিহ্যের কথা।[১] আমরা জৈন তীর্থঙ্করের জীবনী থেকে দেখতে পাই যে বুদ্ধ ও মহাবীরের সমসাময়িক, খৃস্ট পূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর আজীবিক সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা নালন্দা গ্রামের অধিবাসী গোশাল মঙ্খলিপুত্ত পূর্বাশ্রমে স্বয়ং একজন সামান্য 'মঙ্খ' বা পটুয়ার পুত্র ছিলেন। পালি মঙ্খ মানে পটকার বা পটুয়া। রাজগৃহ নগরীতে ও গ্রামগ্রামান্তরে পটচিত্র দেখানই ছিল তাঁর জাতব্যবসা। ঠিক এখনকার বাংলার পটুয়ারা যেমন ঘুরে বেড়ায় জীবিকার্জনের জন্যে নিজের আঁকা ছবি ও নিজের রচনা করা ধর্মমূলক গান গেয়ে। এই থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে অন্ততঃ আড়াই হাজার বছর আগে থেকে ভারতবর্ষে পট ও পটুয়ার চল ছিল নিঃসন্দেহ। পটুয়া ছিল এখানকারই মত একাধারে গ্রামীণ শিল্পী, কবি ও গায়ক। আমরা ক্রমশঃ জানতে পারছি, বিশেষ অনুসন্ধানের ফলে, যে হাজার হাজার

বছর ধরে ভারতবর্ষের নানা জায়গায়, শুধু বাংলা দেশে নয়, সাধারণের শিক্ষা, চিত্তবিনোদন ও বিভিন্ন ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হত জড়ানো কিম্বা চৌকাপট। এইটাই ছিল তখনকার শিক্ষা বিস্তারের **'audio-visual mass media'.**

এছাড়াও পট ও পটুয়াদের এবং বিশেষ করে লোকশিল্পের নিজস্ব গোষ্ঠীর অস্তিত্ব সম্বন্ধে আশ্চর্যজনক প্রমাণ পাই খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতকে লেখা পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী থেকে[২]। পাণিনি স্পষ্টভাবে তুই শিল্পী শ্রেণীকে আলাদা উল্লেখ করেছেন ঃ (ক) গ্রামশিল্পী যারা কেবলমাত্র গ্রামের লোকেদের প্রয়োজনমত ছবি আঁকেন বা মূর্তি তৈরী করেন পোড়ামাটিতে, কাঠে কিম্বা ধাতুতে; (খ) রাজশিল্প, অর্থাৎ কাশিকাকথিত রাজানুগ্রহপুষ্ট সভাশিল্পী যারা রাজার আদেশমত বা রুচি অনুযায়ী শিল্পসৃষ্টি করেন। শুধু তাই নয় পতঞ্জলি তাঁর 'মহাভাষ্যে' বিশেষভাবে বর্ণনা দিয়েছেন রাস্তার ধারে কিভাবে লোকশিল্পীরা কংসবধের পালা চিত্রিত পটের সাহায্যে দেখাচ্ছেন। বৌদ্ধ ও জৈন সাহিত্যে এই শ্রেণীর শিল্পকে 'শৌভিক' বা 'শোভনিক' আখ্যা দেওয়া হয়েছে। পাণিনির এই সুস্পষ্ট নির্দেশ থেকে বেশ বুঝতে পারা যায় যে তুই শিল্পরীতির চলন ছিল একই সময় পাশাপাশি। মহারাজ অশোকের বাস্তবধর্মী মৌর্যভাস্কর্য ও শুঙ্গযুগের ভারহুতের কল্পনাশ্রয়ী ভাস্কর্যের বৈপরীত্য এই বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচায়ক, ঐতিহাসিক যুগের প্রারম্ভেই।

আমার মতে আরো ঢের আগেই ভারতের শিল্পবিকাশের ঊষাতেই অর্থাৎ ভারতীয় প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকেই এই বিস্ময়কর অথচ অনস্বীকার্য পার্থক্যের দৃষ্টান্ত পাই নানাভাবে। পাঁচ হাজার বছর আগেই নগরকেন্দ্রিক হরপ্পা সভ্যতার অপূর্ব শিল্প সম্ভারের মধ্যে পাই এই তুই বিভিন্ন গোষ্ঠীর সম্যক পরিচয়। হরপ্পা, মহেঞ্জোদাড়ো ও অন্যান্য নগরীর ধ্বংসাবশেষের তাম্র ও ব্রোঞ্জযুগের অগাণত নিদর্শন-গুলিকে সহজেই তু'ভাগে ভাগ করা যায়—প্রথম শ্রেণীর, যেগুলি

নিঃসন্দেহে বাস্তবধর্মী ; যেমন হরপ্পার জীবন্ত পাষাণ খোদিত মস্তকহীন নগ্নপুরুষমূর্তি, মহেঞ্জোদাড়োর পুরোহিত ও ব্রঞ্জনির্মিত লাস্যময়ী নর্তকী ও পশুমূর্তি লাঞ্ছিত অসংখ্য 'সীল'। এসবই গড়েছেন শিল্পী প্রাকৃতিক প্রেরণা ও অনুভূতি নিয়ে। দ্বিতীয় শ্রেণীতে আমরা পাই উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত থেকে দাক্ষিণাত্য ও গুজরাট থেকে মালব, যুক্ত-প্রদেশ এই বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে ; অসংখ্য পোড়ামাটির পুতুল ও চিত্রাঙ্কিত মৃৎপাত্র প্রায় সম্পূর্ণ কাল্পনিক।

পোড়ামাটির পুতুলগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হাতেগড়া মাতৃকামূর্তি। এই ধরনের পুতুলগুলির মাথায় মুকুটের মত (fanlike) শিরোবেষ্টনী, পাখীর ঠোঁটের মত দুই আঙ্গুলের চাপ দিয়ে সুতীক্ষ্ণ নাক! চোখ দুটি ও স্তনযুগল ছোট ছোট মাটির চাক্তি দিয়ে তৈরী, গলায় শোভিত মালা ও সারি সারি হার, কানের ভারী অলংকার এবং কোমরে অল্পপরিসর মেখলা বা কৌপীন আলাদা আলাদা মাটির ঢেলা 'applique' পদ্ধতিতে গায়ের সঙ্গে আটকে দেওয়া হয়েছে। সমগ্র মূর্তি অনায়াসে, অল্পসময়ে ও ক্ষিপ্রহস্তে তৈরী—প্রাগৈতিহাসিক লোকশিল্পের সুন্দর দৃষ্টান্ত সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এই মাতৃমূর্তিগুলি খুব সম্ভবতঃ পূজাপার্বণের জন্যই ব্যবহার করত হরপ্পা সভ্যতার গরীব জনসাধারণ। তখনকার কুম্ভকার বা লোকশিল্পী ইচ্ছা করেই এগুলির মধ্যে একটা আদিম ও ভয়ঙ্কর ভাব ফুটিয়ে তুলতেন। এই ধরনের পুতুল এত বেশী পাওয়া গেছে যে এখনকার বাংলাদেশের মাটির পুতুলের মত 'mass scale'-এ তৈরী হত প্রতি ঘরে ঘরে ব্যবহারের জন্য। এটা কি খুবই আশ্চর্যের কথা নয় আজও নাড়া-জোলে, পাঁশকুড়ায়, মৈমনসিংহের ও গোয়ালপাড়ার গ্রামীণ মা পুতুল (ষষ্ঠী) একেবারে প্রাগৈতিহাসিক রীতিতে 'গড়া, কোমরে একটি ছেলে আটকান। হঠাৎ দেখলে চমকে যেতে হয় মহেঞ্জোদাড়ো হরপ্পার মাতৃকামূর্তির সঙ্গে এর আশ্চর্য মিল দেখে। এইভাবেই ভারতীয় লোক-শিল্পের মানস-চেতনার কালাতীত ধারা অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত প্রবাহিত,

মৌর্য, শুঙ্গ, কুষাণ, গুপ্ত, পাল-সেন, মধ্যযুগীয় শৈলীকে অতিক্রম করে। হরপ্পার ধনী সৌখীন শ্রেণীর লোকেরা কিন্তু এসমস্ত স্থূল কাল্পনিক কাজ পছন্দ করতেন না। তাঁদের অনুগ্রহ পুষ্ট অন্য একদল চারুকলার চরম আদর্শ দেখিয়ে সুকুমার শিল্পসৃষ্টি করলেন হরপ্পার বিশ্ববিখ্যাত নগ্ন পুরুষ মূর্তি, মহেঞ্জোদাড়োর নর্ত্তকীমূর্তি ও জীবজন্তুর বিবিধপ্রকার সীলের মাধ্যমে। এইভাবেই আমরা পাই সুপ্রাচীন হরপ্পাশিল্পে লোকশিল্প ও রাজশিল্পের দ্বৈতপ্রকাশ।

হরপ্পা সভ্যতার মৃৎপাত্রের গায়ে আঁকা হয়েছে বলিষ্ঠ সাবলীল তুলির টানে জ্যামিতিক নক্সা, লতাপুষ্প, জীবজন্তু। রাজশিল্পের অনুযায়ী কোনও চিত্রই আঁকা হয়নি নিখুঁতভাবে, ধীরে, সাবধানে। চিত্রে ও ভাস্কর্যে বৃষরূপের বিভিন্ন প্রকাশভঙ্গী দেখলেই সহজেই ধরা পড়ে। মৃৎপাত্রের গায়ে আঁকা বৃষের ছবিতে আমরা পাই পেশীবিহীন ভরাট দেহের অদম্য গতিশীলতা। বিশ্বব্যাপী লোকশিল্পের প্রথানুযায়ী ক্ষণিক মুহূর্তে সচঞ্চলরূপ শিল্পী দেখাতে পেরেছেন অতি অল্পপ্রয়াসে অবলীলাক্রমে। রাজশিল্পের উৎকৃষ্ট উদাহরণ আমরা পাই 'steatite seal'-এ উৎকীর্ণ বিখ্যাত বৃষ মূর্তিগুলির মধ্যে। এগুলি হরপ্পা-চারুকলার চরম দক্ষতার পরিচায়ক। মাংসপেশীবহুল বিপুল শক্তির আধার বৃষগুলি দাঁড়িয়ে আছে নিশ্চলভঙ্গীতে, আভিজাত্য গর্বে গর্বিত। অপর পক্ষে হরপ্পাযুগের গ্রামীণশিল্পের নিদর্শন পাই উত্তর পশ্চিম সীমান্তে পাওয়া 'পেরিয়ানো ঘুণ্ডাই'তে আবিষ্কৃত একটি হাতে গড়া পোড়ামাটির বৃষমূর্তিতে, সীলের পশুর মতই অপূর্ব বললেই হয় দেহ গঠনে। দুঃখের বিষয় এ পর্যন্ত হরপ্পা চিত্রশিল্প নিয়ে এদেশে বা বিদেশে বিশেষ কোনও কাজই হয়নি। ভারতবর্ষের পরবর্তী ঐতিহাসিক যুগে হরপ্পাশিল্প ও সংস্কৃতির দান শুধু পদ্মাসনে উপবিষ্ট সীলমোহরের যোগীমূর্তি, কায়োৎসর্গ ভঙ্গীতে দাঁড়ান দেবমূর্তি, নৃত্যরত নটরাজ কিম্বা নায়িকার ভাস্কর্যেই নিবদ্ধ নয়, হরপ্পার লৌকিক প্রথায় তৈরী অগণিত হাতে গড়া প্রাণী ও মানবমূর্তি এবং সমাধিক্ষেত্রে পাওয়া মৃৎপাত্রের

গায়ে আঁকা জ্যামিতিক নক্সা, পশু, পক্ষী, ফুল, বৃক্ষলতা ও নৈসর্গিক গ্রহ-তারকার মনোরম চিত্রগুলির মূল্যও কম নয়।

প্রাগৈতিহাসিক যুগের অনন্য লোকশিল্পের সঙ্গে আধুনিক গ্রামীণ চিত্রকলার চমৎকার মিল পাই হরপ্পা, মহেঞ্জোদাড়ো, চন্হুদড়ো, লোথাল ও কালিবঙ্গানে আবিষ্কৃত পোড়ামাটির তৈজসপত্র, জালা, থালা, বাটি ও কৌটায়। গাঢ় রঙের গায়ে গাঢ় লালের উপর কাল রঙের বিচিত্র পাত্রের জমি মোটামুটি দুরকমের চিত্র শোভিত (১) জ্যামিতিক (২) প্রাকৃতিক ; যথা অন্যোন্যচ্ছেদ বৃত্ত ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ পাত্র, বলয়, চিরুনি, ফল, ফুল, বৃক্ষ, লতা, জীবজন্তু, মৎস্য-শল্ক, চন্দ্র, সূর্য ও নক্ষত্র। আশ্চর্যের বিষয় এই সব চিত্র ও নক্সা আধুনিক বাংলার কাঁথায় ও আলপনায় বেশীর ভাগই দেখতে পাওয়া যায়। হরপ্পার সমাধিক্ষেত্রে মৃৎপাত্রের[৩] গায়ে আঁকা বৃক্ষলতার সঙ্গে আলপনার অনুরূপ নক্সার আশ্চর্য মিল রয়েছে[৪]। এবং আজকালকার কাঁথা ও আলপনার চতুষ্পত্র ফুল[৫] কি ভাবে প্রেরণা পেয়েছে হরপ্পার মৃৎপাত্রের চিত্রিত **'intersecting circle'**[৬] থেকে তা স্পষ্টই লক্ষ্য করা যায়। সবচেয়ে আশ্চর্য মিল রয়েছে হরপ্পা যুগের আকা অশ্বত্থ গাছের[৭] সঙ্গে পাঁচ হাজার বছর পরে আলপনার অশ্বত্থ গাছের সঙ্গে[৮] রেখারচনায় ও সাঙ্কেতিক আকৃতিতে। হরপ্পার সমাধিক্ষেত্রে পাওয়া মৃৎপাত্রের গায়ে আঁকা বিচ্ছিন্ন পাতার সারির সঙ্গে আলপনা কাঁথা পটের অনুরূপ নক্সার নিবিড় সম্বন্ধও আমাদের চোখে সহজেই ধরা পড়ে।

ঐতিহাসিক যুগের হংসের চেয়ে ময়ূরই ছিল হরপ্পার লোকশিল্পীর সবচেয়ে প্রিয় পাখী। সর্বত্রই ময়ূরের ছড়াছড়ি, যেমন এখন উত্তর ভারতে ও পশ্চিম পাকিস্তানে দেখা যায়। হরপ্পার **Cemetry H.**-এর একটি মৃৎ কলসের গায়ে একটি অত্যাশ্চর্য ছবি পাওয়া যায় নক্ষত্রখচিত নভোমণ্ডলের ভিতর দিয়ে উড়ে চলেছে ময়ূরের ঝাঁক, পেটের মধ্যে সম্পূর্ণ কাল্পনিক মানুষের প্রেতদেহ নিয়ে। ইজিপ্টের শকুনির মত গ্রীস রোমের ঈগল পাখীর মত, চীনের ফিনিক্স পাখীর মত বোধ হয় হরপ্পা

যুগে ময়ূর ছিল তেজোময় অন্তরীক্ষের ও মহাকাশের প্রতীক। তাই শবাধারে অঙ্কিত ময়ূর মানবাত্মার বাহক স্বর্গাভিমুখে। পরবর্তী যুগের ভারতীয় শিল্পচেতনায় কিন্তু ময়ূরের এই বিশিষ্টরূপ কিছুটা লোপ পায়। যদিও পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক যুগে আকাশের অগ্নি ও ক্ষত্রতেজের প্রতীক হিসাবে ময়ূর প্রতীয়মান বিভিন্ন রাজন্যবর্গের মুদ্রায় লাঞ্ছনা হিসাবে ও দেবসেনাপতি ষড়াননের বাহনরূপে। কালিদাসের কুমার-সম্ভবে কুমারের জন্মের সঙ্গে অগ্নির একান্ত ঘনিষ্ঠতা সকলেই জানেন। আরো আশ্চর্যজনক বিষয়, প্রাগৈতিহাসিক বঙ্গে অন্ততঃ খৃঃ পূঃ হাজার বছর আগেকার পাণ্ডু রাজার ঢিবিতে আবিষ্কৃত একটি মৃৎপাত্রে দেখি চিত্রিত ময়ূর ও তার মুখে প্রলম্বিত একটি সাপ। ভারতীয় সংস্কৃতিতে ময়ূর বা পরবর্তীকালের গরুড় সূর্যতেজের ও সাপ জলের প্রতিভূ। তাই আবহমানকাল থেকে দুইয়ের মধ্যে চিরন্তন দ্বন্দ্ব। পাণ্ডুরাজার ঢিপিতে পাওয়া আর একটি মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশে ঘূর্ণায়মান আবর্ত ও মাছ এখনও বাংলার কাঁথা ও আলপনার রূপ-সজ্জায় ব্যবহৃত হয়, কালের অবিশ্রাম গতি ও পার্থিব জীবনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের ইঙ্গিত দিয়ে পাণ্ডুরাজার ঢিপির আনুমানিক প্রায় তিন হাজার বছর পরে ১৭-১৮শ শতাব্দীর যুগের বাংলার নানা মন্দিরের গায়ে বসান নক্সাকাটা পোড়ামাটির টালিতে ময়ূর ও সাপের চিত্রটি ধরে রেখেছে লোকশিল্পী সযত্নে। বঙ্গদেশে অন্ততঃ নিম্নগাঙ্গেয় উপত্যকায় সুপ্রাচীনকালে ময়ূর যে অত্যন্ত জনপ্রিয় পাখী ছিল তার সবিশেষ পরিচয় পাই সুন্দরবনের উত্তর প্রান্তে ২৪-পরগণার চন্দ্রকেতু গড়ের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ মিউজিয়ামে ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রত্নতত্ত্ববিভাগের সংগ্রহশালায় রক্ষিত শুঙ্গযুগের কয়েকটি মাটির সীলমোহরে ও তাম্রমুদ্রার সাঁচীর তোরণের মত তোরণের উপর উপবিষ্ট ময়ূরের সুন্দর ছবিতে। জৈন মহাপুরাণে বনবেদিকা, সংশ্লিষ্ট তোরণ ও ময়ূরের কথার উল্লেখ আছে।[৭] কিন্তু যে ময়ূর দুহাজার বছর আগে সুন্দরবন অঞ্চলে এত জনপ্রিয় ছিল এখন

সেখানে একান্ত বিরল। খুবই আনন্দের বিষয় যে স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রীয় শক্তির প্রতীকস্বরূপ প্রাচীন ভারতের সর্বপ্রাচীন সাংস্কৃতিক লাঞ্ছনা ময়ুর আবার ফিরে এসেছে, ভারতের জনমানসে।

রাজানুগ্রহ বা অভিজাতপুষ্ট চারুকলা ভারতবর্ষে চিরস্থায়ী হতে পারেনি ইতিহাসের ক্রমবিবর্তন ও রাজবংশের উত্থান পতনের জন্যই। কোথায় মৌর্য শিল্প, গুপ্ত, পাল-সেন, চোলচালুক্য শিল্প? কালের অপ্রতিহত গতির মধ্যে তারা সকলেই বিলুপ্ত। কিন্তু রাজশিল্পের সাময়িক আলোড়ন সত্ত্বেও যুগযুগান্তরের লোকশিল্প এখনও ধারাবাহিক ভাবে বেঁচে আছে যদিও স্তিমিত ভাবে, তার শাশ্বত আদর্শ ও আঙ্গিক নিয়ে, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা, যুক্তপ্রদেশ, রাজস্থান, গুজরাট, মধ্য-প্রদেশ ও দাক্ষিণাত্যে। আমাদের নিজেদের অজ্ঞানতায় ও অবহেলায় বাংলার লোকশিল্পের ধারাকে যদি একেবারেই লোপ পেতে দিই তবে এটা নিশ্চিত, যে বাংলার কৃষ্টির অন্তত: অর্ধেক নষ্ট হয়ে যাবে। বিভিন্ন সমাজসেবী ও শিক্ষা উন্নয়নমূলক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ও সরকারের চেষ্টায় যাতে এই সর্বনাশ না ঘটে সে বিষয়ে আমাদের সচেতন থাকা উচিত। বাংলার পট-পাটা, কাঁথা-সরা, ছাঁচে আলপনায় পিতলকাঁসা কাঠ ও পোড়ামাটির বিচিত্র কারুকলার মধ্যে নিহিত রয়েছে আমাদের জীবনের বিস্মৃতযুগের সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক উপলব্ধির ধনভাণ্ডার। এর সামাজিক মূল্যও কিছু হীন নয়। নানাদিক দিয়ে বাংলার লোকশিল্পের মূল্যায়ন করতে গেলে চাই আরও সংগ্রহশালা, আলোচনাচক্র ও প্রদর্শনী।

গ্রন্থপঞ্জী

১। 'অন্যমনে' পত্রিকা, চৈত্র, ১৩৭৮, ১২-১৬ পৃঃ

২। পাণিনির ব্যাকরণ, সূত্র

৩। Wheeler, R. E. M.—The Indus Valley Civilisation, Cambridge, 1953, Fig. 12

৪। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর—বাংলার ব্রত, চিত্র ২৫
৫। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর—বাংলার ব্রত, চিত্র ৫৬
৬। Wheeler, R. E. M, *loc, cit*, Fig. 12
৭। Starr, R. F. S., Indus Valley Painted Pottery, 1941, Fig. 121
৮। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর—বাংলার ব্রত, চিত্র ৩৪

২৪-পরগণার প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন

আমাদের সুখ দুঃখ পতন উত্থানের বহু স্বপ্ন জড়িত বহু শতাব্দীর সুপ্তি এবং জাগৃতির সাক্ষ্য এই বঙ্গভূমি; এর ধূলিকণার সঙ্গে আমাদের পূর্বগামীদের জড়িয়ে আছে দেহাবশেষ; তাদের নিঃশ্বাস-বায়ু রয়েছে এর বাতাসে। গঙ্গা-করতোয়া, ব্রহ্মপুত্রের স্রোত-বিধৌত হিমালয় ও সাগর সীমায়িত এই বাংলার প্রান্তে প্রান্তে কত গোপন কাহিনী নিরুদ্ধ আবেগ নিয়ে বাঙালীকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে; কত গ্রামের পথে, নদীকূলে দীঘির তীরে বনে উপবনে কি সৌন্দর্যের সমারোহ, কি প্রাণ-প্রাচুর্য, কি মোহ! এই বাংলার অধিবাসী আমরা; বাঙালী বলে আমরা গৌরব বোধ করি; ভারত সংস্কৃতিকে বৈশিষ্ট্য এবং স্বাতন্ত্র্যে আমরা সমৃদ্ধ করেছি বলে আমাদের শ্লাঘা। কিন্তু এই বৈশিষ্ট্য এবং স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে আমরা কতটুকু সচেতন! যে প্রাচুর্য এবং বৈচিত্র্য নিয়ে একদিন বাংলার প্রাণ-প্রবাহ ভারত-ভূমিকে উদ্বুদ্ধ করেছিল তার কতটুকু উত্তরাধিকার আমাদের আছে! বিনষ্ট জীবনস্রোত আজ পঙ্কিল ঘূর্ণীর মধ্যে আবর্তিত হচ্ছে; ভাবাবেগে পরিপ্লুত বাংলা আজ পথভ্রান্ত। এই ভ্রান্তির মধ্যে যদি আবার স্থিতাবস্থা লাভ করতে হয়, বর্তমানকে ব্যবস্থিত এবং ভবিষ্যৎকে পরিনির্মাণ করতে হয় তবে ঘনিষ্ঠভাবে দেশের দিকে দৃষ্টিপাত করতেই হবে—কেননা সকল প্রাণৈশ্বর্যের আধার মানুষের ধাত্রী তাদের জন্মভূমি। এই জন্মভূমির প্রতি হস্ত পরিমিত জমির সঙ্গে পরিচয় এবং ঘনিষ্ঠযোগ তার জন্য দরকার।

বাংলার দক্ষিণ পরিধিব্যাপী বিস্তৃত অঞ্চল বনভূমি। এই বন-ভূমিতে প্রকৃতির সৌন্দর্য যেমন আছে তেমনি আছে এর হিংস্রতার সহস্র পরিচয়; বঙ্গভূমির উত্থানপতনের সঙ্গে সঙ্গে এই সুন্দরবন অঞ্চলের উত্থানপতনের ইতিহাসও অতি বিচিত্র। পলি মাটিতে

গড়া কলকাতা নগরীর বুনিয়াদ পত্তন করতে গিয়ে আজও সোঁদরী কাঠের গুঁড়ি উঠে আসে, প্রমাণ করে কলকাতাও একদিন বিস্তৃত হরিৎ-কৃষ্ণ বনভূমির দ্বারা আচ্ছন্ন ছিল। আবার এই কলিকাতারই দক্ষিণে চেত্‌লার কোনও একজায়গায় ওয়ারেন হেস্টিংস-এর সময়ে বেরিয়েছিল গুপ্তযুগের একঘড়া স্বর্ণ মুদ্রা। ঐ অঞ্চলের একটি মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত গুপ্তযুগের লাল পাথরের একখানি বুদ্ধমূর্তি এখনও সাক্ষ্য দিচ্ছে গুপ্ত আমলে ঐ অঞ্চলের সমৃদ্ধির কথা। তারপর গহন অরণ্যের অভ্যন্তরে আজও জটার দেউল নদীর জলে দীর্ঘ ছায়া ফেলে পাল যুগের সাক্ষ্য বহন করছে। সুন্দরবন অধ্যুষিত অঞ্চলের এই প্রাচীন কীর্তি বহুদিন থেকেই অনুসন্ধিৎসুর দৃষ্টি আকর্ষণ করছিল। পুরাতত্ত্ব বিভাগের বহু কর্মচারী, খ্যাতনামা প্রত্নতাত্ত্বিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আরও অনেকে এই অঞ্চলের পুরাতত্ত্বের অনুসন্ধান করেছেন। এই প্রসঙ্গে স্বভাবতই মনে হয় মজিলপুরের বিদগ্ধ পুরাতত্ত্বানুরাগী স্বদেশপ্রেমিক কালিদাস দত্তের কথা; তিনি অক্লান্ত পরিশ্রমে এই অঞ্চলের বহু পুরাকাহিনী জনসাধারণের গোচর করেছেন; স্বভাবতই তিনি আমাদের ধন্যবাদভাজন।

বহুদিন পূর্বে সুন্দরবন অঞ্চল পরিভ্রমণ কালে আমি একখানি তাম্রপট্টলি আবিষ্কার করি। এক অজ্ঞাত পরিচয় রাজ্যপালের বিবরণ সমৃদ্ধ এই পট্টলি এক অতি আশ্চর্য রেখাচিত্রে সমৃদ্ধ ছিল; এই রেখাচিত্রে ভারতীয় চিত্রকলার এক বিশিষ্ট পরিচয় বিবৃত আছে। সেই অবধিই সুন্দরবন অঞ্চল সম্পর্কে আমি বিশেষ সচেতন এবং আশুতোষ চিত্রশালা প্রতিষ্ঠিত হবার পর সুন্দরবন সম্পর্কে আরও বহু সংবাদ সংগৃহীত হয়েছে। বারাসাতের সন্নিকটবর্তী বেড়াচাঁপার চন্দ্রকেতুর গড়ে প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে মৌর্য এবং প্রাক্ মৌর্য যুগের বসতির সন্ধান মিলেছে। ডায়মণ্ডহারবারের সন্নিকটবর্তী হরিনারায়ণপুর, কলকাতার নিকটবর্তী বোড়াল, বারুইপুরের নিকটবর্তী আটঘরা ইত্যাদি বহু অঞ্চল তাদের প্রত্নৈশ্বর্য নিয়ে বিস্তৃততর অনুসন্ধানের

অপেক্ষা করছে। একদল নবীন কর্মী বিশেষ উৎসাহ নিয়ে এই লুপ্ত স্মৃতির উদ্ধারে প্রবৃত্ত হয়েছেন। আমি তাঁদের অভিনন্দন জানাচ্ছি। কাজ আরম্ভ হয়েছে ; কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন দিক থেকে নানা প্রকারের বিরূপ প্রতিক্রিয়াও আত্মপ্রকাশ করছে। আজ অনন্যমনা হয়ে এই কাজ যদি চালিয়ে যাওয়া যায় তবে বহু প্রাচীন কীর্তির পুনরুদ্ধার হবে ; আত্মসচেতনতা প্রতিষ্ঠিত হবে ; আত্মবিশ্বাস বাড়বে। জাতির সর্বাঙ্গীন উন্নতির পথে তা হবে পরম সহায়।*

---

* সুন্দরবন সংস্কৃতি সম্মেলনের প্রথম পর্যায় 'সুন্দরবন পরিক্রমা'য় উদ্বোধনী ভাষণ, ৩রা আশ্বিন ১৩৬৪।

গাঙ্গেয় নিম্নবঙ্গে প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার

প্রাচীন আর্যাবর্তের মথুরা, কোশাম্বী এবং পাটলিপুত্র প্রভৃতি অঞ্চলের মত বাংলাদেশও পুরাতাত্ত্বিক বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে সমধিক প্রসিদ্ধ, একথা অনেকেরই ধারণার বাইরে। বেশ কিছুদিন আগে পর্যন্ত বাংলাদেশের পৌণ্ড্রবর্ধনই (উত্তরবঙ্গ) একমাত্র পুরাতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের উপযুক্ত কেন্দ্র বলে অনুমান করা হোত। গাঙ্গেয় নিম্নবঙ্গে পুরাতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের ফলে দু'হাজার বছরের প্রাচীন বহু নগর ও বন্দর আবিষ্কৃত হওয়ায় উপরোক্ত তথ্য ভ্রান্ত ধারণায় পর্যবসিত হয়েছে। এই অনুসন্ধানের পৃষ্ঠপোষক ছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ মিউজিয়ম। আশুতোষ মিউজিয়মের পৃষ্ঠপোষকতায় চব্বিশ পরগণা, মেদিনীপুর এবং হাওড়া প্রভৃতি অঞ্চলের সরস এবং উর্বর ভূমি উৎখননের ফলে প্রচুর পরিমাণে পুরাতাত্ত্বিক বিষয়বস্তুর সন্ধান পাওয়া গেছে। এই পুরাতাত্ত্বিক বিষয়-বস্তুর কেন্দ্রগুলি কলকাতার উপকণ্ঠে, পঞ্চাশ মাইল পরিধির মাঝে একটা মালার মত ছড়িয়ে আছে। বিগত কুড়ি বছরের প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের ফলে যে ছয়টি ইতিহাসপ্রসিদ্ধ স্থান পাওয়া গেছে, তাছাড়া আরও চারটি প্রাচীন বসতির চিহ্ন সম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েছে। এই সফল অনুসন্ধানের প্রতিক্রিয়া অত্যন্ত আশ্চর্যজনক।

দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার প্রাচীনতম বন্দর তাম্রলিপ্ত, বর্তমান তমলুকে গত কয়েক বছর ধরে যে প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান চলেছিল তার ফলে প্রচুর পরিমাণে এবং বিচিত্র ধরনের মৌর্য, শুঙ্গ এবং কুষাণ যুগের পোড়া মাটির ফলক ও পুতুল পাওয়া গেছে। ফলকগুলিতে বৌদ্ধজাতক কাহিনী অতি সুন্দরভাবে চিত্রায়িত আছে। একটি অপরিচিত বিস্ময়-কারী স্বর্ণমুদ্রা ও অনুশাসন সম্বলিত 'সীল'ও এখানে পাওয়া গেছে। এছাড়া একটি পাষাণ দেবী মূর্তিতে পালযুগের ভাস্কর্যের ছাপ স্পষ্টই

প্রতীয়মান হয়। এছাড়া আরও অনেক বিষয়বস্তুর মাঝে শিল্পীর কুশলী মননের পরিচয় ঘটে।

মেদিনীপুরের অবশিষ্ট চারটি স্থানের মধ্যে তিলদাতে ১৯৫৫ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নেতৃত্বে যে প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখনন করা হয়েছিল তার ফলে কুষাণ গুপ্ত যুগের স্থাপত্যের ভগ্ননিদর্শন ছাড়াও মাটির উপর থেকে একটি বিস্ময়কর পোড়ামাটির ফলক পাওয়া গিয়েছে যার মধ্যে খ্রীস্টীয় প্রথম শতকের গ্রীক লিপির চিহ্ন বর্তমান। ভারতবর্ষে এধরনের ফলক বোধকরি এখানেই প্রথম পাওয়া গিয়েছিল। অনুসন্ধানের ফলে একটি সুন্দর গুপ্তযুগীয় খৃঃ ৪র্থ শতাব্দীর বুদ্ধমূর্তি সম্বলিত একটি ফলক পাওয়া গিয়েছে। একটি অনন্যসাধারণ সুন্দর এবং জীবন্ত নারীর পূর্ণ মুখাবয়ব মেদিনীপুরের পান্না নামক স্থানে পাওয়া গিয়েছে। উন্নত রুচিবোধ এবং বিদগ্ধ শিল্পসত্তার পরিচায়ক এই মূর্তিটি খুব সম্ভবতঃ গুপ্তযুগীয় বলে অনুমান করা হয়েছে। এ ছাড়াও ভগ্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এবং লিপি সম্বলিত একটি গজলক্ষ্মীর মূর্তি শিলাবতী নদীর ধারে পাওয়া গিয়েছে। রঘুনাথবাড়ীর প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের ফলে কতকগুলি পোড়ামাটির নাগমুখ (head) পাওয়া গিয়েছে। মধ্য আমেরিকার এ্যাজটেক শিল্পে এ ধরনের মুখ অত্যন্ত আশ্চর্যের সঙ্গে লক্ষ্য করা যায়। অপেক্ষাকৃত আরও নিকটবর্তী সমুদ্র উপকূলে বাহিরি নামক স্থানে কুষাণ গুপ্ত এবং মধ্যযুগীয় পোড়ামাটির খেলনাগাড়ী, হাতী, ভেড়া, ঘোড়া ইত্যাদি পশুর মূর্তি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া গিয়েছে।

কলকাতার উত্তরপূর্বে মাত্র পঁচিশ মাইল দূরে চব্বিশ পরগণার বেড়াচাঁপা নামক স্থানের নিকটে চন্দ্রকেতুগড়ে প্রত্নতাত্ত্বিক বিষয়বস্তুর সন্ধান পাওয়া গিয়েছে তাদের বিস্তৃতি প্রাক্-মৌর্যযুগ থেকে গুপ্তযুগ পর্যন্ত ছিল বলে অনুমান করা হয়। ১৯৪৮ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ মিউজিয়মের নেতৃত্বে চন্দ্রকেতুগড়ের সরেজমিন তদন্ত হয়। অতঃপর ১৯৫০ সনে উৎখননের ফলে দুই বর্গ মাইলব্যাপী প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের অবস্থিতি আবিষ্কৃত হয়েছে এবং এই প্রাচীন ধ্বংসা-

বশেষের চতুর্দিকে একটি আয়তাকার প্রাচীরবেষ্টিত গড়ও আবিষ্কৃত হয়েছে। এই প্রাচীরের কোন কোন অংশ প্রায় তিরিশ ফুটেরও বেশী উঁচু।

চন্দ্রকেতুগড়ে প্রাপ্ত পুরাতাত্ত্বিক বিষয়গুলি বিভিন্ন ধরনের। প্রায় একশত **'silver punch-marked coin'** পাওয়া গিয়েছে। এই জাতির মুদ্রাকে ভারতের প্রাচীনতম মুদ্রা বলে অনুমান করা হয়। খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক থেকে প্রথম খ্রীস্টাব্দের মধ্যে লিখিত বহু পোড়ামাটির সীলমোহরও এখানে আবিষ্কৃত হয়েছে। সীলের অক্ষরগুলি প্রাচীন ব্রাহ্মী বলে অনুমান করা হয়েছে। এছাড়া উত্তর ভারতীয় কাল পালিশ করা ভাঙা হাঁড়িকুড়ির টুক্‌রো **(N.B.P.)**, রুলেট **(rouletted wares)** মৃৎপাত্র, রোমান মদের পাত্র, গ্রীক প্রভাবান্বিত পোষাকে এবং বিদেশীয় পাদুকা সজ্জিত মূর্তি-কুষাণলিপি সম্বলিত মৃৎপাত্রের অংশ এবং শুঙ্গ কুষাণ যুগের বহু সুন্দর সুন্দর হাতী, ঘোড়া এবং ভেড়ার খেলনাগাড়ী পাওয়া গিয়েছে। হাতী, ঘোড়া ও ভেড়া বৈদিক ধর্মের ইন্দ্র, সূর্য ও অগ্নির প্রতিনিধিত্ব করে বলে অনেকেই অনুমান করেন। প্রসঙ্গতঃ বলাই বাহুল্য যে অসংখ্য মিথুন ফলকও এই সঙ্গে পাওয়া গিয়েছে। মিথুন ফলকগুলির অধিকাংশই খ্রীস্টীয় প্রথম ও দ্বিতীয় শতকের। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় এই যে চন্দ্রকেতুগড়ে একটি গুপ্তযুগের স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া গিয়েছে যার মধ্যে অত্যন্ত সুন্দরভাবে গুপ্তরাজ্যের প্রথম চন্দ্রগুপ্ত এবং কুমারদেবীর বিবাহের দৃশ্য উৎকীর্ণ করা আছে। মুদ্রাটি প্রথম চন্দ্রগুপ্তের সুযোগ্য পুত্র সমুদ্রগুপ্তের প্ররোচনায় নির্মিত হয়েছিল এবং এই ধরনের মুদ্রা বাংলাদেশে সর্বপ্রথম চন্দ্রকেতুগড়েই আবিষ্কৃত হয়েছিল। চন্দ্রকেতুগড়ে পোড়ামাটির খেলনাগাড়ীর মাঝে খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের সূর্যরথের অবস্থিতি অত্যন্ত বিস্ময়কর। অনুরূপ সূর্যরথ পশ্চিমভারতে প্রায় সমকালীন যুগে ভাজা চৈত্যগুহার ঢোকবার পাশে চিত্রায়িত করা হয়েছিল।

বাংলাদেশের তথাকথিত প্রাচীনতম বুদ্ধের মূর্তি. চন্দ্রকেতুগড়ের খনামিহিরের ঢিপিতে পাওয়া গিয়েছে। লাল রঙের বালিপাথরের বুদ্ধের এই মূর্তিটি শিল্পকলার পদ্ধতি পরিকল্পনায় সমকালীন মথুরার ভাস্কর্যের কথা মনে করিয়ে দেয়। মথুরায় এই ধরনের মূর্তি দ্বিতীয় খ্রীস্টাব্দে তৈরী হয়েছিল বলে প্রত্নতাত্ত্বিকেরা অনুমান করেন। ঐ একই স্থানে গোলাকৃতি চাকার ধরনের কেশবিন্যাসে একটি নারীমূর্তি অভূতপূর্ব রূপ ধারণ করেছে। সেই বিগত কালের এই বিচিত্র কেশ-বিন্যাস এই যুগের নারীদের মনে কৌতূহল, এমনকি হিংসারও উদ্রেক করতে পারে। চন্দ্রকেতুগড়ের এই নারী মূর্তিটি খুব সম্ভবতঃ খ্রীস্টপূর্ব তৃতীয় শতকে মৌর্য আমলে তৈরী হয়েছিল এবং একই ধরনের মূর্তি **'Archaeological Survey of India'**র প্রচেষ্টায় পাটনা, হস্তিনা-পুর এবং তমলুক থেকে আবিষ্কৃত হয়েছিল। উপরোক্ত পুরাদ্রব্যগুলির আপাতঃ সৌন্দর্য এবং কৃষ্টিগত প্রাধান্য ছাড়া যখন লিপি সম্বলিত সীলগুলি এবং সীলগুলির মধ্যে উৎকীর্ণ চিত্রগুলির পূর্ণ পরিচয় লাভ সম্ভবপর হবে তখন হয়তো প্রথম শতাব্দীর আগের এবং পরের বিদ্যাধরী নদীর বুকে প্রাচীন বাংলার সভ্যতার কোন নতুন হদিশ হয়তো পাওয়া যেতে পারে।

আশুতোষ মিউজিয়মের নেতৃত্বে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল উৎসাহী প্রত্নতাত্ত্বিক ১৯৫৭ সালে চন্দ্রকেতুগড়ে প্রাথমিক উৎখনন করেন (**trial-digging**)। ইতিপূর্বে ভূপৃষ্ঠে অনুসন্ধানের ফলে যে প্রাচীন তথ্যের ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছিল—সেই তথ্য আরও ভালভাবে প্রতিষ্ঠিত হোল এই উৎখননের মাধ্যমে। চন্দ্রকেতুগড়ে উৎখননের ফলে মৌর্যযুগ থেকে শুরু করে গুপ্তোত্তর যুগের বাংলার লোকদের ধারা-বাহিক সভ্যতার একটা তথ্য পাওয়া গিয়েছে। কতকগুলি লালরঙের মৃৎপাত্রের আবিষ্কারের মধ্যে কোন কোন প্রত্নতাত্ত্বিক মৌর্যপূর্ব সভ্যতার অবস্থিতি ইঙ্গিত করতে চেয়েছেন।

G. Goswami "the occupation levels of early periods show the signs of Kachcha houses built of wood, bamboo and tiles and mud walls on mud plinth. Evidences of the destruction of the houses by fire in ancient time have also been brought to light. At a comparatively late period brick houses were built and a portion of a pavement of two courses of bricks of such a structure has been exposed in course of the excavation. One of the earliest occupation levels was associated with a drain of pottery pipes (each of which measures 2 ft. 7 inches in length 8 inches on larger end and 5 in. on smaller end in diameter) east to west. It has been dug out 1 ft. below the present water level (which is about 12 ft. below the surface of the mound). This drain may safely be ascribed to the Maurya period as high class N.B.P. sherds with a metallic sound peculiar to the Maurya and pre-Maurya periods in other ancient sites of northern India, have also been discovered here. Another very interesting but partial discovery of a ramp like structure of rammed concrete gradually sloping from east to west has been unearthed from a low level (8-9 ft.) in one part of the excavated area. This was probably adopted by the early inhabitants of this part of Bengal as a protective measure against the onrush of tidal waves or flood water. Later on,

a stupendous rampart wall of mud constructed on this peculiar ramp for the defence of the city against man and nature,"

বর্তমান লেখকের তত্ত্বাবধানে চন্দ্রকেতুগড়ে কিছুদিন আগে প্রত্ন-তাত্ত্বিক উৎখনন ও অনুসন্ধান করা হয়েছিল। চন্দ্রকেতুগড়ের খনা-মিহিরের ঢিপিতে এবং ইটখোলা নামক স্থানের কিছু কিছু অংশে উৎখনন কার্যাদি চালানো হয়েছিল। ইটখোলার কাছে গড়ের প্রাচীরের **cross section** উৎখনন প্রণালীর সাহায্যে ঐ স্থানের প্রাচীনত্ব ও বিভিন্ন যুগের সভ্যতার ইতিবৃত্তকে গড়ে তোলবার একটা প্রচেষ্টা হয়েছিল এবং সেই সঙ্গে প্রাচীরের নির্মাণপদ্ধতি কি ছিল তাও জানবার সুযোগ হয়েছিল। ২০' × ২০' গর্ত করে **vertical digging** পদ্ধতিতে ইটখোলার উৎখনন করা হয়। প্রাচীরের সর্বোচ্চ স্থানে গভীরতম খননকার্য চালানোর পর ২৩ ফুট গর্ত করা সত্ত্বেও সভ্যতার ছোঁয়ার বাইরের প্রাকৃতিক মাটির সন্ধান পাওয়া যায়নি। উৎখননের পর ৮-৩ নং **(layer)** মাটির স্তর পরীক্ষা করে অনুমান করা হয়েছে যে প্রাচীরটি খুব সম্ভবতঃ খ্রীস্টপূর্ব প্রথম শতকে বহিঃশত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য নির্মিত হয়েছিল। প্রাচীরের উপরের অংশের ইতিহাস বিক্ষিপ্ত; স্থানীয় কৃষকদের কৃষিকার্যের ফলে প্রাচীরের উপরের অংশের ইতিহাসের ধারায় বহু দুর্যোগ পরিলক্ষিত হয়।

উত্তর ভারতের প্রাচীন প্রাচীরগুলি তৈরী হয়েছিল ইটের কিন্তু ইটখোলার প্রাচীরে কোন ইটের চিহ্ন নজরে পড়ে না। প্রাচীরটি তৈরী হয়েছিল সম্পূর্ণ মাটিতে। নগর প্রাচীরের চারদিকে অতিপ্রাচীন কাল থেকে পরিখা নির্মাণ করে প্রাচীরকে আরও সুদৃঢ় করা হোত। ইটখোলার মাটির নীচের অংশে কেবলমাত্র কাদামাটির উপস্থিতি ও প্রাচীনকালের পরিখার অবস্থিতি ইঙ্গিত করে। প্রাচীরের সর্বনিম্নে গাঁথনী হিসেবে অবশ্য চূণ, সুরকী, ভাঙা ইট এবং ভাঙা মৃৎপাত্র প্রাচীরের গাঁথনীর নীচে কাঠের ঘরের ভগ্নাংশ পাওয়া গিয়েছে। কাঠের

ভগ্নাংশগুলি পরীক্ষা করে অনুমান করা হয়েছে যে সেগুলি খুব সম্ভবতঃ খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের। খনামিহিরের ঢিপিতে যে মন্দিরের ভগ্নাংশ পাওয়া গিয়েছে, তার উৎখনন কাজ প্রায় সমাপ্তির পথে। মন্দিরের ভগ্নাবশেষের মধ্যে যে সমস্ত পুরাদ্রব্য পাওয়া গিয়েছে, তা' পরীক্ষার ফলে উক্ত মন্দিরটি পঞ্চম-ষষ্ঠ খ্রীষ্টাব্দের বলে অনুমিত হয়েছে। মন্দিরের গঠনপদ্ধতিতে কিছু কিছু নতুনত্ব এবছরের উৎখননের ফলে বেরিয়ে এসেছে। খ্রীস্টীয় অষ্টম শতকের একটি পাষাণ ফলকে বিষ্ণুর মূর্তি পাওয়া গিয়েছে। বড় মন্দিরটির কাছেই একটি ছোট মন্দিরের উৎখননের সময় একটি ফলকে পদ্মফুল লক্ষ্য করা যায়। পদ্মের পাপড়ির মধ্যে কিছু কিছু মূল্যবান পাথরও পাওয়া গিয়েছে : খুব সম্ভবতঃ এই ফলকটি 'foundation-tablet' হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিল। প্রায় একই ধরনের 'foundation-tablet' বড় মন্দিরটির গাঁথনীর সঙ্গে পাওয়া গিয়েছিল। মন্দিরটি বিভিন্ন যুগে সারানো হয়েছিল, তারও পরিচয় উৎখননের মাঝে পাওয়া গিয়েছে। উৎখননের ফলে চূণের ভাটা, প্রচুর শামুকের জমায়েৎ (সম্ভবতঃ চূণ তৈরী করার জন্য), অলঙ্কৃত ইট ইত্যাদি পাওয়া গিয়েছে। উৎখননের ফলে মন্দিরটির সামগ্রিক গঠনপ্রণালীর যে চিত্রটি পাওয়া গিয়েছে তার দ্বারা আমাদের মতে মন্দিরটিকে গুপ্তযুগীয় সারনাথ এবং নালন্দার মন্দিরের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে।

অপেক্ষাকৃত অনুল্লেখ্য পুরাবস্তুর মধ্যে দুহাজার বছরেরও আগেকার বহু তামার ছাঁচে ঢালাই মুদ্রা (cast-copper coin) পাওয়া গিয়েছে—যার মধ্যে অধিকাংশই কালের ব্যবধানে ক্ষয়ে গিয়েছে। এই রকম একটি তামার মুদ্রার সোজাদিকে চৈত্যের উপর অর্ধচন্দ্রের প্রতিকৃতি আছে। বিভিন্ন ধরনের পাথরের পুঁতি বিভিন্ন ধরনের পোড়ামাটির পুতুল, কেটলির মত মকরমুখী নল লাগানো পাত্র, উত্তরভারতীয় কালো পালিশ সম্বলিত সূর্য, চক্র ও পদ্ম চিহ্নবিশিষ্ট মৃৎপাত্রের ভগ্নাবশেষ, ধূসর এবং কালরঙের গার্হস্থ্য জীবনে প্রয়োজনীয়

মৃৎপাত্র, কিছু বিদেশীয় আদর্শে নির্মিত মৃৎপাত্র প্রাচীন চন্দ্রকেতুগড়ের ইতিবৃত্তের স্বাক্ষর বয়ে নিয়ে চলেছে।

বিদ্যাধরী ভাগীরথীর একটি শাখা নদী। বহুকাল আগে থেকে বহু ইতিবৃত্তকে সঙ্গে নিয়ে বয়ে চলেছে সমুদ্রের পানে। অধুনা কলকাতার নোংরাকে এবং অতিবৃষ্টির জলধারাকে টেনে নিয়ে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে বিদ্যাধরীর বুকে। কিন্তু এই বিদ্যাধরীর আশে পাশে যে সুন্দর, অদৃষ্টপূর্ব এবং কৌতূহলোদ্দীপক পুরাবস্তুর সন্ধান পাওয়া গেছে তার দ্বারা একথা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে বিদ্যাধরীর পাশে চন্দ্রকেতুগড়ও একসময় একটা বড় বন্দর ছিল। প্রাধান্যের দিক দিয়ে বিচার করলে চন্দ্রকেতুগড় রূপনারায়ণের পাশে তমলুকের বন্দর অপেক্ষা কোন অংশেই ছোট ছিল বলে মনে হয় না।

বিদ্যাধরীর আশে পাশে শহর, বন্দর, বিহার, মন্দির একদা গড়ে উঠেছিল, সে কথা আরও ভালভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বেড়াচাঁপার সাত আট মাইল দূরে খাস বালন্দা নামে একটি জায়গায় পুরাবস্তুর সন্ধান লাভ করায়, খাস বালন্দার একটি গুপ্তযুগীয় মন্দির কালের ব্যবধানে মসজিদে পরিণত হয়েছে দেখতে পাওয়া যায়। বিদ্যাধরীর অপেক্ষাকৃত আরও নিম্ন অঞ্চলে 'ধারা'তে পালযুগের মৃৎপাত্রের সন্ধান পাওয়া গেছে। 'ধারা' খাস বালন্দার একটি প্রতিবেশী অঞ্চল। হয়তো নেপালীয় পুঁথির বৌদ্ধবিহার বলন্দের সঙ্গে খাস বালন্দের কোন সম্পর্ক থাকতে পারে কিন্তু বলন্দের প্রকৃত অবস্থিতি এখনও পর্যন্ত রহস্যজনক। ধারা'র কয়েক মাইল দূরে ভাঙড় নামক একটি স্থানে (কলকাতা থেকে বার মাইল দূরে) একটি সাড়ে তিন ফিট দীঘল-সুন্দর বোধিসত্ত্ব মঞ্জুশ্রীর মূর্তি পাওয়া গিয়েছে। কষ্টিপাথরের এই মূর্তিটি সম্ভবতঃ একাদশ খ্রীস্টাব্দে নির্মিত হয়েছিল, ফলে খাস-বালন্দার সঙ্গে নেপালীয় বলন্দবিহারের সম্পর্কের রহস্য হয়তো আরও সরল হয়ে এসেছে। নেপালীয় দরবার গ্রন্থাগারের পুঁথি থেকে জানা যায় যে উত্তরবঙ্গের জগদ্দল বিহারের মূল দেবতা ছিলেন বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বর। তেমনি মঞ্জুশ্রীও বলন্দ-

বিহারের হয়ত মূল পূজ্য দেবতা ছিলেন। উপরোক্ত ধারণা আরও সুন্দররূপে প্রতিষ্ঠিত হয় যখন অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা নামক পাল বৌদ্ধপুঁথিতে বলন্দ বিহারের উল্লেখ আমরা পাই। আলোচ্য পুঁথিটি বলন্দতেই লিখিত হয়েছিল বলে অনুমান করা হয় এবং সমস্ত পুঁথিটি দেবী প্রজ্ঞাপারমিতার উদ্দেশ্যে অর্পিত হয়েছিল। এই সম্পর্কে উল্লেখ-যোগ্য তথ্য হচ্ছে যে প্রজ্ঞাপারমিতা মঞ্জুশ্রীর শক্তি।

প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের ফলে আশুতোষ মিউজিয়মের উৎসাহী কর্মিবৃন্দ ডায়মণ্ডহারবারের মাইল চারেক দূরে আরেকটি পুরাতত্ত্বে প্রসিদ্ধ স্থান আবিষ্কার করেছে। এই স্থানটির নাম হরিনারায়ণপুর। প্রত্নতাত্ত্বিক বিষয়বস্তু যখন উপরোক্ত মিউজিয়মে আনীত হয়, তখন সেই বস্তুগুলি শুঙ্গ-কুষাণ যুগের বলে অনুমিত হয়। গঙ্গার তীরে অবস্থিত হরিনারায়ণপুরের এই ঐতিহাসিক স্থান গঙ্গার প্রবল স্রোতে ক্ষীয়মাণ হয়ে চলেছে প্রতিনিয়ত। হয়তো বা অতীতের সেই ভুলে যাওয়া, হারিয়ে যাওয়া সরস্বতীর উপত্যকায় হরিনারায়ণপুর একটা ঐতিহ্যমণ্ডিত বন্দর ও পোতাশ্রয় ছিল। নদীর স্রোতে ভেঙে যাওয়া তটের মাঝে পাওয়া গিয়েছে বহু পুরাতাত্ত্বিক বস্তুনিচয়· কোনটা ভাঙ্গা, কোনটা ঘষে যাওয়া বা কোনটা বা অম্লের প্রতিক্রিয়ায় জীর্ণ-শীর্ণ। রোমান জগতের এবং রোমান আদর্শে নির্মিত বহু ভগ্ন মৃৎপাত্র, মৌর্যপূর্ব, মৌর্যযুগীয়, উত্তরদেশীয় কাল পালিশ করা পাত্র হরি-নারায়ণপুরে পাওয়া গিয়েছে। তমলুকে এবং চন্দ্রকেতুগড়ে প্রাপ্ত যক্ষিণীমূর্তির মত এখানেও শুঙ্গ যুগের পোড়ামাটির যক্ষিণীমূর্তি পাওয়া গেছে। এছাড়া প্রাচীন যুগের ছাঁচে ঢালাই অনেক তামার মুদ্রা পাওয়া গেছে। এই মুদ্রাগুলির মধ্যে দুটিতে ভেড়া এবং উটের প্রতিকৃতি দর্শকদের আশ্চর্য করে। এছাড়া পাওয়া গেছে অসংখ্য পাথরের পুঁতি এবং পোড়ামাটির প্রাচীন সীল। প্রত্নতাত্ত্বিকদের মধ্যে এই পুঁতি এবং সীলগুলি হয়তো প্রাগৈতিহাসিক যুগের।

কয়েক মাস পূর্বে চব্বিশ-পরগণার 'আটঘরা'য় খ্রীস্টপূর্ব যুগের

একটি প্রাচীন সভ্যতার হদিশ পাওয়া গেছে। কলিকাতার দক্ষিণে মাত্র বারো মাইল দূরে এই আটঘরাতেও তমলুক, হরিনারায়ণপুর এবং চন্দ্রকেতুগড়ের মত বহু পুরাদ্রব্যের সন্ধান পাওয়া গেছে। অদৃষ্টপূর্ব তামার ছাঁচে ঢালাই মুদ্রা, পোড়ামাটির সীল এবং যক্ষিণী মূর্তি ছাড়াও গ্রীকভাবধারায় নির্মিত বলিষ্ঠ দৃঢ় যোদ্ধার মূর্তি এবং শুঙ্গ-কুষাণ যুগের আরও অগণ্য দ্রব্যাদি আটঘরাতে আবিষ্কৃত হয়েছে।

গত বছর শীতের মরসুমে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মিউজিয়লজি বিভাগের এবং আশুতোষ মিউজিয়মের গবেষকগণের সম্মিলিত অভিযানের ফলে সুন্দরবনের জি. প্লটে বুড়োবুড়ির তটে জঙ্গলাকীর্ণ বর্তমান সুন্দরবনের অতীতের এক সভ্যতার পদচিহ্ন আবিষ্কৃত হয়েছে। প্রাচীনকালের ঐতিহ্যবাহী রাজা ডম্মণপালের তাম্রশাসন পাওয়া গিয়েছে। তাম্রশাসনটি ১১৯৮ খ্রীস্টাব্দে উৎকীর্ণ হয়েছিল। বর্তমান লেখক এই তাম্রশাসনটি ১৯২৯ খ্রীস্টাব্দে আবিষ্কার করেন। এছাড়া মজিলপুরের কালিদাস দত্তের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে সুন্দরবনের বহু মূর্তি আশুতোষ সংগ্রহশালায় সংগৃহীত হয়েছে। উপরোক্ত অনুসন্ধানকারী দলের প্রচেষ্টায় সুন্দরবনে প্রাপ্ত গুপ্ত ও কুষাণ যুগীয় মৃৎপাত্রের আবিষ্কারের ফলে সুন্দরবনের ইতিহাস আরও প্রাচীন বলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অনুসন্ধানের মাধ্যমে একটি একাদশ শতকের সহস্র-লিঙ্গ মূর্তির ভগ্নাবশেষ পাওয়া গিয়েছে। অনুসন্ধানকারী এই দলটি সুন্দরবন অঞ্চলে সমুদ্রগুপ্তের দুটি 'archer-type' মুদ্রার খবর আনিয়েছেন পুরাতন স্থাপত্যের ভগ্নাবশেষ হিসেবে কতকগুলি ১২" × ১৬" মাপের ইটও পাওয়া গিয়েছে এবং নদীর জোয়ারের ধাক্কায় প্রচুর প্রাচীন স্থাপত্যের ভগ্ননিদর্শন বেরিয়ে এসেছে বলে খবর পাওয়া গিয়েছে। উপরোক্ত বিষয়বস্তুর মাঝে সমুদ্রগুপ্তের সাম্রাজ্যের 'ব্যাঘ্রতটী-মণ্ডলে'র হয়তো কোন সম্বন্ধ স্থাপিত করা যেতে পারে।

বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের উৎখনন এবং অনুসন্ধানের মাঝে উপরোক্ত এই ইতিহাসপ্রসিদ্ধ স্থানগুলি আবিষ্কৃত হওয়ায় শুধুমাত্র

ভারতের সংস্কৃতি এবং ইতিহাসের একটি অজানা অধ্যায় সংযোজিত হয়েছে তাই নয়, বাংলাদেশেরও অন্ততঃ একটা দু'হাজার আড়াই হাজার বছরের প্রাচীন সভ্যতা আছে তাও প্রমাণ করা সম্ভব হয়েছে। আজকের দিনে সুন্দরবন বলে যে স্থানটি পরিচিত, অতীতে সেইখানেই একসময় গড়ে উঠেছিল বাংলার নিজস্ব এক প্রাচীন সভ্যতা। কতক-গুলি পুরাবস্তুর মাধ্যমে প্রাচীন বাংলার সঙ্গে প্রাচীন গ্রীক ও রোমান জগতের বাণিজ্যিক সম্বন্ধের তথ্যটিও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং পরিশেষে একথা অনুমান করা অসম্ভব নয় যে পূর্ব ও পশ্চিম সমুদ্র উপকূলের মত বাংলাদেশের উপকূলেও একদা গড়ে উঠেছিল বিদেশী আগন্তুক বণিকদের বসতি।

উড়িষ্যার মণ্ডনশিল্প

ভারতবাসীর মধ্যে প্রাচীন উৎকলবাসী তাদের রচিত সুচারু ও রমণীয় বিচিত্র অলঙ্কারখচিত সুমহান মন্দিরগুলির জন্য সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত। মণ্ডনশিল্পের সাধনায়, তারা যে কত অগণিত সৌন্দর্যমালা রচনা করেছিল—কত অভিনব রূপ ও রেখার সমন্বয়ে অপরূপ অলঙ্কার সৃজন করেছিল, তার বিস্তৃত বিচার এই সামান্য প্রবন্ধের বিষয় নয়। কিন্তু তথাপি এটা অকুণ্ঠিত চিত্তে বলা যেতে পারে যে, প্রাচীন উৎকলশিল্পী এই ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে সর্বোচ্চস্থান অধিকার করেছে।

প্রাচীন উৎকলবাসী পাষাণ শিল্পে যে নৈপুণ্য ও চাতুর্য দেখিয়েছে তা' জগতের রূপকলারাজ্যে ও শিল্পকলার ইতিহাসে চিরদিনই একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে থাকবে। মন্দিরের কারুকার্যে, বিশেষ-করে, প্রতীকবহুল চিত্রালঙ্কার ও রূপসৌন্দর্যের বিকাশ পরিলক্ষিত হয়। উৎকলশিল্পী নব নব রূপের কল্পনা করে এবং নব নব মূর্তি খোদিত করে যে আনন্দলাভ করত তা' অন্য দেশ ও জাতির মধ্যে বিরল। এই শিল্পসাধনা তার জীবনধারার সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে এমনই মিশে গিয়েছিল যে, তার চিত্তের সমগ্র ভাবধারা নয়নাভিরাম অলঙ্কার ধারারূপে প্রকাশিত হোত।

উড়িষ্যাশিল্পী কেবলমাত্র কাল্পনিক চিত্রচাতুর্য দেখিয়ে ক্ষান্ত হয়নি। দেবমন্দিরকে শ্রীসম্পদে ও শোভার ঔজ্জ্বল্যে ভূষিত করবার জন্য প্রাচীন মিশর, ব্যাবিলন ও আসিরীয়গণের ন্যায় সে প্রাণিজগতেরও আশ্রয় নিয়েছিল বিভিন্ন চেতনার প্রতীকস্বরূপ। বৃক্ষ-লতা-পুষ্পের মতো সেখান হতেও আপনার রূপতৃষ্ণার ও রূপকল্পনার উপকরণ সংগ্রহ করেছে প্রাচীন ভারতবর্ষে বিভিন্ন যুগের ও প্রদেশের শিল্পীর সঙ্গে যোগ রক্ষা করেই। যে দৃষ্টি বস্তুর বহিরাবরণ ভেদ করে তার গঠনভঙ্গির অন্তরালে অনবদ্য রসের সন্ধান পায়, সে দৃষ্টির দ্বারা শিল্পী

অতি তুচ্ছ ও হেয় বস্তুর মধ্যে আপনার শিল্পকলার প্রেরণা পায় এবং যে কল্পনা থাকলে, সেই অন্তরের বস্তুস্বতন্ত্র রূপকলার অভিনব শ্রী ধারণ করে এবং এক অমূর্ত কল্পনারাজ্যের সৃষ্টি করে থাকে, সে দৃষ্টি উড়িষ্যাশিল্পীর ছিল! তা না হলে সে বনের পশুপক্ষীর গঠন-ভঙ্গীটুকু প্রস্তরগাত্রে উৎকীর্ণ করে এক অবিনশ্বর কীর্তি স্থাপন করতে পারত না। আজ যে জগতের সুসভ্যদেশের সুধী ও সহৃদয় সমালোচকগণ উড়িষ্যার মন্দির আচ্ছাদিত লতাপুষ্প ও জীবজন্তুর কাজ দেখে মুগ্ধ ও বিস্মিত হয়েছেন, সেই শিল্পের মূলে যে কতখানি গভীরতা ও রসবস্তুর অনুভূতি তা' বর্তমানের সাধারণ শিল্পীর বা সাধারণ দর্শকের কল্পনার অতীত। বর্তমানে এমন কোনও মণ্ডন-শিল্প-বিশারদ আছেন কিনা জানি না যাঁর বা যাঁদের রূপকল্পনা উড়িষ্যা-শিল্পীর সান্নিধ্য লাভ করতে পারে। দেব-দেবী, নায়ক-নায়িকার মনোরম বেশভূষণ ছাড়াও উড়িষ্যাশিল্পী প্রাকৃতিক জগৎ থেকে কত মনোহর আকৃতি, কত সুন্দর অঙ্গবিন্যাস, কত সুঠাম অঙ্গভঙ্গি, কত বিচিত্র চলন আপনার শিল্প কল্পনার আলোকে উদ্ভাসিত করে প্রোজ্জ্বল ও ভাস্বর রূপচ্ছটায় মন্দিরগাত্র ভূষিত করেছে। যে পশু-পক্ষীর শক্তি বা আকৃতি তাদের আকৃষ্ট করেছিল বা যাদের কাছে মানুষ উপকারের ঋণে আবদ্ধ ছিল কিংবা যাদের ভীষণ মূর্তি মানব-চিত্তে ত্রাস উৎপন্ন করত তারা সকলেই উড়িষ্যাশিল্পীর চিত্তমানসে স্থান পেয়েছিল।

উড়িষ্যার দেবদেউলে প্রত্যেকটি মূর্তি নবসৌন্দর্যমণ্ডিত হয়ে সৃষ্ট হয়েছিল শিল্পীর সুরুচি ও সুকৌশল যত্নে। প্রাণিরাজ্যের প্রায় সকলেই এই ভাস্কর্যখচিত দেবায়তনে স্থান পেয়েছিল এবং প্রথা অনুযায়ী সে সকল শোভন পশুমূর্তিকে উৎকীর্ণ করে শিল্পী অশেষ চাতুর্য প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছিল। এই সকল জীবশ্রেণীর মধ্যে যে কেবলমাত্র পশুরাজ সিংহ, মাতঙ্গ, অশ্ব, মৃগ প্রভৃতি মূর্তিই মন্দির-গাত্র শোভা সম্পাদন করবার জন্য প্রযুক্ত হয়েছিল তা' নয়, হংস,

মীন, বানর, মেষ, সারমেয়, কূর্ম, শুক, সর্প, বরাহ, বৃষ এমনকি সামান্য দর্দর ও কর্কট পর্যন্ত—মানবের অতি ভয়ঙ্কর শত্রু হতে তার অতি অন্তরঙ্গ গৃহপালিত পশু পর্যন্ত সকলকেই নির্বিচারে সমাদৃত করেছিল।

ভারতীয় শিল্পীর বাস্তবের এই সজীব ও মর্মস্পর্শী অনুকরণ এবং পাষাণশিল্পের কুহক-মন্ত্রবলে উৎকীর্ণ পশু-পক্ষীর জীবন্ত ব্যঞ্জনা, সবিশেষ জ্ঞান, অনুধাবন ও পারদর্শিতার সাক্ষ্য আজও দিচ্ছে। 'লিঙ্গরাজে'র অপূর্ব সিংহমূর্তি, 'মুক্তেশ্বরে'র সুন্দর সুঠাম, ক্রীড়া-কৌতুকমত্ত বানর যূথ, 'রাজরাণী'র সাবলীল ছন্দ 'অনন্তবাসুদেব' ও 'কোনার্কে'র বলদৃপ্ত গজগামিনী ; সূর্য দেউলের অনলোপম তেজস্বী ও প্রাণবান যুদ্ধাশ্ব ও করীযুগল, ভারতীয় রূপকারের অবিনশ্বর স্মৃতিস্তম্ভরূপে এখনও বিজয় ঘোষণা করছে।

প্রাচীন উড়িষ্যাশিল্পী ভারতবাসী, তার হৃদয়ে দেবতা ও দেব-মন্দিরের প্রতি যে অকৃত্রিম অবিচলিত ভক্তি ছিল তা' সর্ববাদিসম্মত। দেবগৃহ ও অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে সর্বব্যাপী অকল্যাণকর মন্ত্রশক্তি হতে রক্ষা করবার জন্য ভক্ত শিল্পীর সবিশেষ প্রয়াস দেখতে পাওয়া যায়। ভয় আদিম মানবের স্বাভাবিক ও সহজাত সংস্কার। ভারতীয় শিল্পী ও ভারতশিল্প প্রভাবিত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সর্বদেশীয় শিল্পী এই ভয়ের বশবর্তী হয়ে আপনার দেবতা, দেবপ্রাসাদকে, অমঙ্গল, অশুচি ও অন্তরীক্ষের প্রতিকূল পিশাচাদির প্রভাবকে প্রতিহত করবার জন্য দেবালয়ের গাত্রে নানারূপ রক্ষাকারী প্রতীক খোদিত করেছেন। তারা সেই সকল বিরাট সুবিশাল ও সুমহান ধর্মমন্দিরগুলিকে অশুভ প্রভাব হতে রক্ষা করবার জন্য নীলাকাশপটে ও দ্বারদেশে অমিত-বিক্রমদ্যোতক মহাকায় আক্রমণোন্মুখ গজসিংহ মূর্তি স্থাপন করেছিল। এই গজ-সিংহগুলি উত্তরে সুবর্ণরেখা হতে দক্ষিণে গঞ্জামের বংশধরা নদী পর্যন্ত সমগ্র উৎকল-স্থাপত্যের বিশেষ চিহ্ন স্বরূপ। ঠিক একই উদ্দেশ্যে তোরণশীর্ষে, প্রাচীরগাত্রে ও প্রাচীরকোটরে স্থাপিত দেবদেবী

মূর্তির মস্তকে কিম্ভূতকিমাকার কীর্তিমুখগুলি উৎকীর্ণ হত। জাভা ও উড়িষ্যার অগণিত ভীষণদর্শন কীর্তিমুখ এখনও দর্শককে ভয়ে অভিভূত করে। সেজন্য অগ্নি, তেজ ও সূর্যের এই প্রতীক, শৃঙ্গযুক্ত সিংহমুখ মন্দিরদ্বার ও দেবমূর্তির শীর্ষে বিরাজিত হত। শিল্পশাস্ত্রের নির্দেশানুযায়ী মন্দিরগাত্রেও বিরাটাকায় রহস্যময় 'বিড়াল' মূর্তি সকল ছায়াঘন রেখদেউল ও জগমোহনের প্রাচীরের অন্তরালে ভয়াবহরূপে প্রকটিত। এই সকল কাল্পনিক এবং বিরাটাকায় দানব-মূর্তির প্রহেলিকাময় গূঢ়ার্থ প্রকৃতি চিরদিনই মণ্ডনশিল্পীর দৃষ্টিতে শিল্পসৌন্দর্যবর্ধনের উপকরণ-রূপে সমাদৃত হত। আদিম ও অসভ্য পূর্বপুরুষদের নিকট হতে ত্রাস ও বিভীষিকার স্বাভাবিক সংস্কার হতেই উৎকলশিল্পী ইন্দ্রজাল-গুণ-সম্পন্ন এই সকল ভীষণ অপ্রাকৃতিক রূপ কল্পনা করতে অনুপ্রাণিত হয়েছিল।

কিন্তু এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে শুধু অগ্নিতেজই সৃষ্টির সহায়ক নয়---সঙ্গে চাই জল। সেইজন্যই জলের রূপকস্বরূপ মকর হস্তীশুণ্ড, কুম্ভীর ও মৎস্য সংযুক্ত অদ্ভুত অপ্রাকৃতিক জলজীব---ভারত-শিল্পীর অনন্য কল্পনা-সৃষ্টি জল ও তেজের সম্মিলনের প্রকৃতির বিকাশ, বৃক্ষলতা ও পৃথিবীর যাবতীয় মানবের জীবনধারণের উপযোগী তৃণশস্য উৎপন্ন হয়। সেজন্যই ভারতীয় শিল্পী তোরণশীর্ষে নভোমণ্ডলে কীর্তিমুখ ও জীবনের ধারক ও অমরত্বের অধিকারী তোরণপার্শ্বে নীচে দুই মকর মুখ লতাপাতার নকশার দ্বারা সংযোজিত করে জীবনের প্রহেলিকা অঙ্কিত করেছেন সুন্দরভাবে। খৃস্টপূর্ব ৩য় শতাব্দীতে রাজগীরের নিকট বরাবরগিরির লোমশঋষিগুহা তোরণে আমরা প্রথম কুম্ভীরাকৃতি মকরের আবির্ভাব দেখি। ঠিক একই উদ্দেশ্যে উড়িষ্যার শত শত প্রাচীন মন্দিরে চৈত্যগবাক্ষে, সিংহাসন-পৃষ্ঠে ও লতামণ্ডলে আমরা পাই মকরের ছড়াছড়ি। মুক্তেশ্বর মন্দিরের পুরোভাগে অবস্থিত সুবিশাল মকর-তোরণ সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সমুদ্রপারে চম্পা ও কম্বোজে (আধুনিক ভিয়েৎনাম ও কাম্বোডিয়া) মন্দিরস্থাপত্যে মকরের প্রাধান্য বিশেষ লক্ষণীয়। জাভার বিশ্ববিখ্যাত

বোরাবুদুর মন্দিরের প্রবেশ পথে বিভিন্ন মকরতোরণগুলিও কলা-কৌশলের আশ্চর্য নিদর্শন।

দেবদেবী, নরনারীর বেশভূষণের বিচিত্র নৈপুণ্য ছাড়াও উড়িষ্যার চিত্রমাত্রেই অলংকারের আতিশয্য দেখা যায়। সুললিত গঠনভঙ্গিমা ও রেখাঙ্কনের প্রতি রূপকারের এখানে যে অপূর্ব অনুরাগ ছিল, তা' অন্যান্য জাতির মধ্যে বিরল। সপ্তম হতে ত্রয়োদশ, সাতশত শতাব্দীর মধ্যে উড়িষ্যাশিল্পীদের অসাধারণ রসানুভূতি ও শোভনপ্রবৃত্তির গৌরবময় প্রচেষ্টার আরম্ভ, সম্পূর্ণ মৌলিক শিল্পসৃষ্টির বিপুল উদ্যম, এবং সর্বোপরি তাদের জাতীয় প্রতিভার উন্মেষ ও পূর্ণ প্রকাশ শিলাবক্ষে দেখা যায়। খ্রীস্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রথম ভাগে ভুবনেশ্বর ক্ষেত্রে, শত্রুঘ্নেশ্বর মন্দিরে অনিয়ন্ত্রিত ও অপরিপক্ক হস্তের মণ্ডনশিল্পের প্রথম প্রয়াসের স্থূল আভাস পাওয়া যায়। অষ্টম শতাব্দীতে গঠিত পরশুরামেশ্বর মন্দির, রূপকারের দক্ষতা ও কারিগরির বিশিষ্ট উন্নতির পরিচায়ক। প্রায় সমসাময়িক বৈতালদেউলের রমণীয় পুষ্পলতার, বিশেষতঃ 'পাম' পুষ্পের সুস্পষ্ট পরিকল্পনা ও মনোরম অঙ্কন শিল্পপ্রতিভা ও সৌন্দর্যগ্রাহিতার ক্রমবিকাশের অপরূপ পরিচয় দেয়। এই সুপ্রাচীন যুগের মন্দির-নিচয়ের অলঙ্কারসম্পদের যথেষ্ট প্রাচুর্য ও বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু তৎকালীন শিল্পের অপরিস্ফুট প্রতিভা মন্দিরের বিভিন্ন অঙ্গগুলিকে এক সুরে বেঁধে স্থাপত্যের দিক দিয়ে সামঞ্জস্য সাধন করতে পারে নি। পুরাতন দেবমন্দিরগুলিকে দেখলে পরিষ্কার বোধ হয় যে তাদের অলংকারের প্রকৃতি ও বিন্যাস তখনও প্রাচীন ভারতের নিয়মানুযায়ী, শুঙ্গ ও গুপ্ত যুগের শিল্পভাবার অনুসরণকারী।

দশম শতাব্দীর প্রথম ভাগে যখন উড়িষ্যার শিল্পীরা পুরাতন পথ পরিত্যাগ করে নতুন পথের পথিক হল, মুক্তেশ্বরমন্দির সেই নব-উদ্ভাসিত শিল্পপদ্ধতির পুরোধা-রূপে এখনও দণ্ডায়মান। এটি উড়িষ্যা-শিল্পের যুগান্তর এনেছে। কারণ ঐ সময়েই সর্বপ্রথম উড়িষ্যার জাতীয় শিল্পপ্রতিভার গৌরব ও মহিমা সম্পূর্ণরূপে বিকশিত হয়। ফার্গু-

সন একে উড়িষ্যা স্থাপত্য-শিল্পের রত্ন বলে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু সেই উৎকীর্ণ চিত্রগুলি স্বতন্ত্রভাবে অতি মনোজ্ঞ ও রমণীয় হলেও তাদের সম্মিলিত সৌন্দর্য সৌধ পরিকল্পনার উপযোগী অঙ্গাঙ্গিভাবে সংলগ্ন হয়ে অখণ্ড সৌন্দর্য সৃষ্টি করতে পারে নি। একশত বৎসরের মধ্যেই কিন্তু বিরাট লিঙ্গরাজমন্দিরে এই অপরূপ মণ্ডন সমন্বয় সাধিত হয়েছিল। একাদশ শতাব্দীর রাজারানীর প্রসাধক চিত্রের মধ্যে খ্রীস্টপূর্ব বৌদ্ধচৈত্যবাতায়নের পারসী অক্ষর সাদৃশ্য আশ্চর্যজনক অলংকারে পরিণতি, বিশেষজ্ঞ মাত্রেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। নিবিষ্ট মনে দেখলে এই চৈত্যগবাক্ষ অলংকরণ যে মুক্তেশ্বরের জটিল অথচ মনোমুগ্ধকারী নকশা হতেই উদ্ভূত তাহা বুঝতে কষ্ট হয় না।

মধ্যযুগের মন্দিরগুলিতে অন্যান্য চিত্রাপেক্ষা লতামণ্ডল ও বৃক্ষবল্লরীর প্রাধান্য দেখা যায়। স্থাপত্য অলঙ্কার রূপে ব্যবহৃত যে অপূর্ব কারু-কার্য ও কলাকৌশল কুম্ভস্তম্ভগাত্রে, মাল্যাকৃতি ডালিতে এবং ফুললতা, নটীলতা, পত্রলতা ও বনলতা (উড়িষ্যার শিল্পশাস্ত্র ‘ভুবনপ্রদীপ’ মতে) প্রভৃতি লতার আবর্তনে প্রকাশ পেয়েছে, তা অভিজ্ঞ সমালোচক-গণের মতে গ্রীকশিল্পীর লতামণ্ডল অপেক্ষা সুদৃশ্য ও সুসামঞ্জস্য পূর্ণ। এই জাতীয় কারুকার্যের চিত্তাকর্ষক সৌন্দর্য ও ললিতছন্দ রাজরানী মন্দিরের মণ্ডনমহিমার প্রধান কারণ। মন্দিরপৃষ্ঠ এরূপ সূক্ষ্ম চিত্তরঞ্জিনী অলঙ্কার দ্বারা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে উৎকীর্ণ থাকায়, গভীরভাবে খোদিত বিভিন্ন দেবমূর্তিগুলি অত্যন্ত কমনীয় হয়েছে এবং সুগোল সুঠাম ‘অলস-নায়িকা’দের ললিত-কোমল দেহবল্লরীর লীলায়িত ভঙ্গী ও উদ্দাম যৌবনশ্রীকে সুন্দর ও সুস্পষ্ট করে তুলেছে।

রসলোকের মধ্য দিয়ে অতীন্দ্রিয় দৃষ্টির দ্বারা যে অপরূপ সম্পদ লাভ করা যায় ত্রয়োদশ শতাব্দীর উৎকলশিল্পী কোণারকের সূর্যদেউলে তার চরম প্রকাশ করেছে। পূর্ববর্তী যুগের অভিজ্ঞতালব্ধ যা কিছু সুন্দর ও মনোমুগ্ধকর তারও সামঞ্জস্য সাধন করেছে। ভাস্কর্য ও স্থাপত্যের মাধ্যমে, বিচিত্র কারুকার্যের প্রাচুর্যে তাদের চমৎকার গঠনে

ও নিখুঁত সমানুপাতে এই মহান দেবালয়ের ধ্বংসাবশেষ শুধু উড়িষ্যা কেন সারা ভারতে অতুলনীয়। উড়িষ্যার স্থাপত্যশিল্পাকাশে কোণারকের দেউল একটি অত্যুজ্জ্বল গ্রহ-বিশেষ—কিন্তু দুঃখের বিষয় শেষ স্তিমিত নির্বাপিতপ্রায় প্রদীপের আকস্মিক প্রজ্বলিত শেষ শিখা।

উড়িষ্যার বিচিত্র ও অপূর্ব শিল্পমহিমা যে কেবলমাত্র ঐ দেশের চতুঃসীমার মধ্যে আবদ্ধ ছিল না এবং এর প্রভাব যে প্রাচীন উৎকল-বাসীর সমুদ্র-ভ্রমণ ও উপনিবেশ স্থাপন অভিলাষগুণে, ভারতের বাইরে ভারতীয় উপনিবেশসমূহের স্থাপত্য-ভাস্কর্যে বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয় সে কথা ঐতিহাসিক গবেষণার সাহায্যে ধীরে ধীরে প্রকাশ পাচ্ছে। ব্রহ্মে, শ্যামে, চম্পায়, কম্বোজে, মালয় উপদ্বীপে ও যবদ্বীপের অগণিত বৌদ্ধস্তূপ ও হিন্দুমন্দিরে যে মকর-কীর্তিমুখ, নাগ, সিংহ, হস্তীযূথ ও পুষ্পপত্র অলংকারের যে অসংখ্য চিত্র দেখতে পাওয়া যায় সেগুলি যে মধ্যযুগের উড়িষ্যার স্থাপত্য অলংকারের আদর্শে রচিত তা' নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে।

প্রাচীন উড়িষ্যার এই অপরূপ মণ্ডনশিল্প যে চিরকালই কি প্রত্ন-তাত্ত্বিক গবেষণা ও আলোচনার বিষয় হয়ে থাকবে? এটা নিতান্ত পরিতাপের বিষয়। আমাদের মনে হয়, জাতীয় শিল্প অনুশীলনের এই পুনঃজাগরণের দিনে, অবহেলা ও বিস্মৃতির জাল ছিন্ন করে এই সব মনোরম নকশাগুলি আমাদের দৈনিক জীবনে যথাযোগ্য ব্যবহার করবার সময় এসেছে। আমরা ইচ্ছা করলেই আজকালকার প্রচলিত তৃতীয় শ্রেণীর 'আধুনিক' বিদেশী অলংকারগুলির বৃথা অনুকরণের পরিবর্তে, জাতীয় জীবন ও সংস্কৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে বিজড়িত এই সকল সুচারু প্রাচীন ভারতীয় চিত্রগুলি রেখাঙ্কনে, বস্ত্রশিল্পে, সূচী কার্যে, কারুশিল্পে ও গৃহভূষণ হিসাবে স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করতে পারি। আমাদের দেশে আজকাল প্রাচীন ভারতীয় কলা বললেই সাধারণতঃ লোকে অজন্তা-ইলোরার শিল্পসম্পদই বোঝেন। কিন্তু আমরা বলতে বাধ্য হব এতে উড়িষ্যার ন্যায় মণ্ডনচিত্রের বৈচিত্র্য নেই। পরবর্তীকালের

অসংখ্য মন্দিরগুলির কথা ছেড়ে দিলেও একমাত্র 'বৈতাল'-দেউলের মণ্ডনের অসাধারণ বৈচিত্র্য, প্রাচুর্য ও অপূর্ব কলাকৌশল আমাদের চিত্তকে একেবারে অভিভূত করে ফেলে। আশার বিষয়, সাম্প্রতিক কালে ধীরে ধীরে ভারতীয় মূর্তি ও মন্দিরের এই অফুরন্ত ধনভাণ্ডারের ছায়া পড়ছে মহিলা প্রসাধনে ও জীবনযাত্রার নানা খুঁটিনাটিতে!

'প্রবাসী', জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৭

উড়িষ্যার চিত্রাবলী

উড়িষ্যা তার মনোহর মন্দিররাজির জন্য বিখ্যাত। মন্দিরের চারুকলার ইতিহাসও আজ অল্পবিস্তর সুপরিচিত। কিন্তু এ পর্যন্ত উড়িষ্যার চিত্রকলার পরিচয় আমরা পেয়েছি কিছু খণ্ডিত তালপত্রে অঙ্কিত চিত্র থেকে, আর কিছু আধুনিক পটে। প্রায় কুড়িবৎসর ব্যাপী উড়িষ্যা ভ্রমণকালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ সংগ্রহশালার জন্য ২৫০টিরও বেশী কালানুক্রমিক যে রঙীন চিত্র সংগ্রহ করেছি, তার কতকগুলি থেকে অন্ততঃ গত তিন শতকের উড়িষ্যার চিত্রকলার অজ্ঞাত অংশের উপর কিছুটা আলোকপাত করতে পারবে বলেই মনে হয়। এদের মধ্যে কতকগুলি একেবারে নতুন ধরনের, আর তারা ভারতীয় শিল্পকলার বিবর্তনের এক নতুন ধারার সন্ধান দেয়। উড়িষ্যার চিত্রকলা যে বিভিন্ন যুগে বহির্জগতের শিল্পতরঙ্গে সাড়া দিয়েছে তা দেখা যায়।

প্রথম চিত্রটি (বড় চিত্রের অংশবিশেষ মাত্র) রণপুর থেকে সংগৃহীত একটি আড়ম্বরপূর্ণ দরবারের চিত্র—এর ঐতিহাসিক ও সৌন্দর্যতত্ত্বগত মূল্য প্রচুর (১৮·$\frac{১}{২}$" × ৭$\frac{৩}{৪}$"), জমকালোভাবে সাজানো স্তম্ভশোভিত অলিন্দে উড়িষ্যার এক রাজাকে, এক মুসলমান দূতকে গ্রহণ করতে দেখা যাচ্ছে এখানে। রাজা অটুট গাম্ভীর্যের সঙ্গে বসে মনোযোগ দিয়ে দূতের কথা শুনছেন। দূতের মুখে কূটনৈতিক জ্ঞানের চিহ্ন বর্তমান। আর তাঁর পিছনের লোকটির অবয়বে আভিজাত্য পরিস্ফুট। ধনুর্বাণ ও নগ্ন তরবারি হাতে বসা সতর্ক সভাসদ ও দূতদলের মধ্যে দাঁড়ানো লোকটির সভাগৃহের বাইরে অবস্থিত শ্রদ্ধানম্র সহকারীর সঙ্গে আলাপও কম লক্ষণীয় নয়। রাজার সুসজ্জিত হাবসী রক্ষী ছাড়া আর সকলের মুখই পাশ ফেরানো। রক্ষীর মুখ সোজা অন্দরমহলের দিকে ফেরানো আর ঐ প্রকোষ্ঠের গভীরতা উপরকার আয়ত খিলানের সাহায্যে বোঝানো হয়েছে। রাজা এবং তাঁর ঠিক পিছনের দুজন ওড়িয়া

প্রতিহারীর ভারতীয় প্রথামত ধুতি-চাদর পরা নগ্নদেহ, দূতেদের পরণে কাজকরা ভারী কিংখাব আর মোগল রীতি অনুযায়ী পাগড়ী।

উড়িষ্যার ইতিহাসে বর্ণিত কোন কাহিনীর রূপান্তর এই চিত্রটি দেখে মনে হয় 'আইন-ই-আকবরী'তে বর্ণিত উড়িষ্যার রাজদরবারে গোলকুণ্ডারাজের দৌত্য। চিত্রটি খ্রীস্টীয় সপ্তদশ শতকের শেষ পাদের বলা যেতে পারে।

উড়িষ্যা রাজসভার বিভিন্ন প্রকৃতির চিত্রাঙ্কন রীতি প্রবেশ করেছিল আর তাদের মিশ্রণে চিত্রটিতে বিভিন্ন ভঙ্গীর সমাবেশ ঘটেছে। ভারতীয়, মোগল আর পশ্চিমী রীতিই হ'ল মূল রীতি; পশ্চিম ভারতীয় ও দাক্ষিণাত্য রীতিও এখানে স্থান পেয়েছে। উড়িষ্যার শিল্পীরা অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে এই বিবিধ সূত্রকে আত্মস্থ করেছে। সাজসজ্জার আড়ম্বর ও কারুকার্যের বাহুল্য উড়িষ্যার নিজস্ব। পোষাক ও অন্যান্য বস্তুর খুঁটিনাটির বাহুল্য দাক্ষিণাত্যের। দৃশ্যতঃ বর্ণ বৈচিত্র্য মোগলরীতি অনুযায়ী ব্যবহৃত।

দুটি দলই রীতিমত সচঞ্চল আর ব্যক্তিবিশেষ প্রচণ্ডভাবে সজীব। এদের তুলনায় খাটি মোগল রীতি অনুযায়ী আঁকা চিত্রাবলীতে জাহাঙ্গীর ও সাজাহানের সভাসদদের কাঠের পুতুল বলে মনে হয়। হেলানো মাথার আঁকাবাকা রেখা, প্রসারিত দেহ, বিভিন্ন ভঙ্গিমায় উত্থিত বাহু, বঙ্কিম তরবারি, পতাকা ও দণ্ড, সতর্ক মুখ, উজ্জ্বল ডোরাকাটা আড়ম্বরপূর্ণ পোষাকের কারুকার্য দৈহিক, মানসিক প্রচেষ্টা বা শক্তির প্রতিটি স্তরের পূর্ণ বিকাশ ঘটায়। চোখের মণিতে একটি বিন্দু ব্যবহার করে চোখের দ্যুতিকে প্রকাশ করাতে সাহায্য করা একটি পশ্চিম ভারতীয় রীতির দাক্ষিণাত্যের ব্যবহার। প্রত্যেকটি মুখ-পূর্ণ মাত্রায় ব্যক্তিকেন্দ্রিক।

চিত্রটির গঠনে মোগলরীতি পুরোপুরি অনুসৃত হয় নি। লম্বাটে কারুকার্যের মাঝখানে বিভিন্ন কক্ষে কাহিনীটি বিবৃত করা হয়েছে। প্রচলিত মোগলরীতি অনুযায়ী প্রধান চরিত্রকে সকলের উপরে বিশেষ

কোন স্থানে বসানো হয়নি। মোটামুটিভাবে রাজকীয় ও দৌত্যে নিযুক্ত অর্ধবৃত্তাকার দুটি দলকে মধ্যবর্তী একটি স্তম্ভের সাহায্যে দ্বিধাবিভক্ত করা হয়েছে।

ডোরাকাটা ও ফুলকাটা কিংখাবের পোষাকের ঔজ্জ্বল্যেই বিশেষতঃ রঙের ব্যবহার খুবই জীবন্ত। লাল, হলুদ, সবুজ পাটকিলে আর কমলা রঙই বেশী ব্যবহৃত। বিভিন্ন জাতি ও শ্রেণীর স্তরবিভাগ অজন্তার মত এখানেও রঙ দিয়ে বোঝানো। আমীর ওমরাহদের গায়ের রঙ হলদে বা ঈষৎ লালচে-পাটকিলে দিয়ে আঁকা। পরিচারকরা কৃষ্ণকায়, হাবসী খোজার গায়ের রঙে লালচে কালোর আভা। প্রধান দুটি চরিত্র রাজা ও দূতের মুখ পাশ থেকে দেখানো হয়েছে আর পিছনের পশ্চাৎপট হচ্ছে ঘোর নীল ও লালের। পশ্চিমীরীতি অনুযায়ী মুসলমানদের মুখের আভাসটি এঁকে তাতে রঙ চড়ানো হয়েছে। কিন্তু অন্যত্র প্রাচীন ভারতীয় প্রথা অনুযায়ী সরাসরি রঙ দিয়েই আঁকা হয়েছে। ঘোর রঙের পশ্চাৎপটের সামনে ফিকে বা ফিকে রঙের সামনে ঘোর রঙ ব্যবহৃত হয়েছে। দুরূহরীতি আর অত্যুজ্জ্বল রঙের হাত থেকে চোখকে মুক্তি দেবার জন্য নিয়মিতভাবে, ছন্দের তালে তালে, মাঝে মাঝে হলদে রঙ ব্যবহার করা হয়েছে।

পরের চিত্রটিও একই রীতির ও সময়ের। এটি নয়াগড়ের জঙ্গল থেকে সংগৃহীত, চিত্রটি পাতলা ছেঁড়া দোমড়ানো একটুকরা কাগজে আটকানো। কিন্তু তবু টুকরাটি একটি অমূল্য সম্পদ। ভারতীয় কলায় এর তুলনা নেই। ফিকে পাটকিলে আর নীল রঙের মাঝে মাঝে হলদে রঙে আঁকা একটি অসম্পূর্ণ ছবিতে (১২$\frac{১}{২}$″ × ৭$\frac{১}{৪}$″) লক্ষণীয় অথচ স্বাভাবিক ভঙ্গীতে সাহসী অশ্বারোহীদের দল বেঁধে যাওয়ার দৃশ্য দেখা যায়। এখানেও মোগল প্রভাব সুস্পষ্ট।

এটির অন্যতম বৈশিষ্ট্য এর রৈখিক গঠন। দেহের ডৌল এখানে সামান্য অংশ গ্রহণ করেছে। নক্সা থেকেই অনেক কিছু বোঝা যায়। বঙ্কিম গ্রীবা, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, নৃত্যশীল অশ্বরাজি, চঞ্চল চরণ পরস্পরের সঙ্গে

জড়াজড়ি করেছে। আমাদের কানে অশ্বপদশব্দ, হ্রেষা বা বর্মের ঝনঝনা আসে বলে মনে হয়। চোখে ইস্পাতের উজ্জ্বল দ্যুতি, বক্র ও কোণাকার গতিরেখা পরস্পরকে অতিক্রম ও পুনরতিক্রম করেছে। তারা দৃঢ়সংবদ্ধ ও সম্মুখবর্তী দুরারোধ্য গতির বৃহত্তর তালে বাঁধা। সূক্ষ্মাগ্র শ্মশ্রুমণ্ডিত কতকগুলি মুখ গর্বিত, উদ্ধত ও স্থিরনিশ্চয়; তাদের ব্যক্তিত্ব এমনি সুপ্রকাশ যে উদ্ধত বল্লমধারী মূর্তিটিকে দাক্ষিণাত্যে যুদ্ধযাত্রী অভিজ্ঞ সেনার নায়ক আওরঙ্গজেব বলতে লোভ হয়।

এই আভাসচিত্রে অশ্বারোহী বাহিনী পদাতিক বাহিনীর শেষ দু-জনের শ্রেণীবদ্ধ পা, দোলায়িত হাত আর তরবারির তের্ছা সমান্তরাল দ্বারা সামনে আকৃষ্ট হচ্ছে মনে হয়। ঘনসন্নিবিষ্ট নীল অশ্বরাজির সামনে উদ্যত পদ সাদা অশ্বগুলি চোখকে বিশ্রাম দেয়। তেজস্বী প্রাণীগুলিকে রক্তমাংসের চেয়ে লৌহ-ইস্পাতে গঠিত বলে মনে হয়। অশ্বরাজি আর জড়ো হওয়া মূর্তিগুলি চাপাচাপি করে যে ত্রৈমাত্রিক আকার সৃষ্টি করেছে তা' মোগলরীতির চেয়ে পশ্চিমী রীতিরই অনুরূপ। চিত্রটিতে বিভিন্ন বিরুদ্ধ রীতির সংমিশ্রণ। পদাতিক বাহিনীর দূর প্রসারিত পদরাজি অজন্তার স্মৃতি জাগরূক করে এমন শক্তিশালী অথচ সংক্ষিপ্ত বর্ণনা থেকে ধরা যায়। নাটকীয়তায় দৃশ্যটি আঙ্কোর ওয়াটের দেওয়ালে আঁকা দ্বিতীয় সূর্যবর্মনের অশ্বারোহী বাহিনীর বিখ্যাত চিত্রের সমতুল্য।

নয়াগড়ে পাওয়া আর একটি চিত্রও প্রায় একই রীতির হলেও, তাতে এমন কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আছে, যার জন্য ভারতীয় কলার বিভিন্ন যুগানুযায়ী শ্রেণী বিশেষের মধ্যে তাকে অন্তর্ভুক্ত করা যায় না, আগেরটির মত এটিও একটি আভাযচিত্র (১২$\frac{1}{2}$" × ১৬$\frac{3}{8}$")। মোগল ও পশ্চিমী রীতির বন্ধন শ্লথ হয়ে ক্রমে ক্রমে প্রাচীন ভারতীয় রীতিতে পুনরাবর্তনের লক্ষণ এতে দেখা যায়! যেমন দেখা যায় খাঁটি উড়িষ্যা রীতির নবপর্যায়ের সূচনা সম্ভবতঃ গীতগোবিন্দের পুঁথি সুশোভিত করার জন্য আঁকা এই আভাসে কৃষ্ণপ্রেমের চারটি অঙ্কিত নিদর্শন

পাওয়া যায়। পূর্ণিমা রাত্রে যমুনা পুলিনে কুঞ্জবনে পুষ্পচয়নকালে গোপিনীরা ক্রীড়ারতা। দর্শনীয় ভঙ্গীতে অঙ্কিত মৃগ ও ময়ূরদম্পতি দৃশ্য-টির রমণীয়তা বাড়িয়েছে। একেবারে পাশফেরানো গোপিনীযুগল নদীর সরল তীরে মধ্যবর্তী বৃক্ষের সম্মুখবর্তিনী হয়েছে। পশুপক্ষীরা নিপুণতার সঙ্গে বহমান নদীর সমতল থেকে চোখকে উর্ধ্বদিকে নিয়ে যায়। অন্য জায়গার মত এখানেও শুধু পাটকিলে, হলুদ, নীল আর সবুজেরই প্রাধান্য দেখা যায়। রেখাঙ্কনের প্রকৃতি খুবই আকর্ষণীয়। কম্পিত, তরঙ্গায়িত বক্ররেখাগুলি প্রসারিত কাঠামোয় ছড়িয়ে পড়েছে। প্রাচীন ভারতীয় রীতির শ্রেষ্ঠ নিদর্শনের অনুরূপ সূক্ষ্মতার প্রতীক হরিণগুলি। নারীদেহ লতায়িত পল্লবের জটিল জালে মিশে গেছে। মুঞ্জরিত পল্লবের ভিতর দিয়ে উঁকি দেওয়া পূর্ণচন্দ্রের কিরণ প্রতিটি পত্রকে সম্পূর্ণ পৃথক করেছে। বহমান নদীর নীল তরঙ্গ প্রাচীন ভারতীয় এক কৌশল অনুযায়ী হেলানো সমান্তরাল রেখা দিয়ে দেখানো হয়েছে। পাশ্চাত্যের বিচক্ষণ ব্যক্তিরা এইটিকে প্রাচ্যশৈলীর একটি অপূর্ব রমণীয় নিদর্শন বলে স্বীকার করেছেন।

তালপত্রে খোদিত আর অঙ্কিত চিত্রে রামের অভিষেক দেখানো হয়েছে। রাম চিত্তাকর্ষক ভঙ্গীতে প্রসারিত এক হাতে বাণ ও অন্য হাতে ধনুক ধরে বসে আছেন। হনুমান তাঁর সামনে মাটিতে বসে তাঁর লীলাসনে বসা গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। লক্ষ্মণ তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে তাঁর মাথার ওপরে রাজছত্র ধরেছেন। তাঁদের মাঝখানে বসানো হয়েছে সীতাদেবীর মূর্তি। অষ্টাদশ শতকের পত্রটির কল্পনা পূজকপন্থী। আর এর রীতি আগের তিনটির থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। চিত্রটি আঁকা হয়েছে প্রাচীন ভারতীয় রীতি অবলম্বন করে।

মূর্তিগুলির দৃষ্টি অন্তর্মুখীই হোক আর বাইর্মুখীই হোক তাদের ডাঃ ক্র্যামরিশ্‌ যাকে বলেন পূর্ণ ভঙ্গিমার আভাষ দেখানো হয়েছে। রামের ক্ষেত্রে দেহটি সামান্য একটু সঙ্কুচিত করা হয়েছে। সাদাসিধে পশ্চাৎপটের সামনে কাটা কাটা ভাবে আঁকা প্রত্যেকটি মূর্তির রৈখিক

অঙ্কন সত্ত্বে ওএকটা নমনীয় ডৌল দেখা যায় যা শুধু নিম্নাঙ্গের গোলালো গঠন, পোষাকের জটিল কারুকার্য আর অলঙ্কারের প্রচুর ব্যবহারেই নয় রঙের যথোপযুক্ত ব্যবহারেও প্রকাশিত হয়েছে, দেহের উত্তমাঙ্গেই রঙ ব্যবহার করা হয়েছে। রাম নীলাভ-সবুজ, সীতা লক্ষ্মণ আর হনুমান উড়িষ্যায় শিল্পীদের প্রিয় রঙ হলদেতে সুপ্রকাশ। ছক কাটা হয়েছে কালোতে। লাল রঙের ব্যবহারে চিত্রটিকে কোন কোন জায়গায় অধিকতর চিত্তাকর্ষক করা হয়েছে।

চঞ্চল, বক্র ও নমনশীল বৃত্তাংশকে দক্ষতার সঙ্গে সম্মিলিত করে প্রায় আক্ষরিক সংজ্ঞার রূপ নিয়েছে। মূর্তিগুলির পোষাক ধৈর্যশীল ও নিপুণ নকসায় পূর্ণ। যুগনাসা ও কৌণিক রেখা প্রাচীন ভারতীয় অঙ্কন রেখানুযায়ী অঙ্কিত, মুখের বঙ্কিমভঙ্গী আর হাত পায়ের দৃঢ়-প্রগতিজ্ঞ গতি শক্তির পরিচয় দেয়। রামের অতি দৃঢ়সংবদ্ধ দেহ ছাড়া অধিকতর শক্তির দ্যোতক আর কি হতে পারে? সীতা যেন আবদ্ধ শক্তির কুণ্ডলিনী রূপ আর সেই শক্তি প্রবলভাবে আশেপাশের মূর্তিদের মধ্যে সঞ্চারিত।

অন্যদিকে মঠের মোহান্তের বসা ছবির ভিতরে আমরা পাই বিরাটত্বের ছাপ। সাদা পশ্চাৎপটের সামনে কমলা রঙের কানাতের নীচে, বিশাল দেহের ফিকে নীল রঙ জ্বলজ্বল করছে। মাথার উপর সুদূর প্রসারী ত্রিমুখী খিলান বিশালত্বটা আরও সুপ্রকাশ করে, স্বাচ্ছল্যের প্রতীক, বহু বৃত্তযুক্ত ব্রাহ্মণ মোহান্তের বিপুল কলেবরের মধ্যে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে উদ্ধত এবং অসহিষ্ণু ক্ষমতার চিহ্ন। তাঁকে শাস্ত্রগত কোন জটিলতা ব্যাখ্যা করতে দেখা যাচ্ছে। নক্সার বিরাটত্বে পটের অঙ্কনরীতি অনুযায়ী পরিকল্পনার বিরাটত্ব সুস্পষ্টভাবে বিদ্যমান। উড়িষ্যা ও বাংলার কোন কোন অঞ্চলে এ রীতি আজও প্রচলিত। আগেকার রীতিতে জটিল নক্সার সূক্ষ্ম কারুকর্মের প্রতি প্রীতি, উপাদানের ছোট ছোট ফুল তোলা। আর খিলানের ডানদিকের খাঁজে উদ্ধত অশ্বের মধ্যে কিছুটা দেখা যায়। গত দুই শতকের উড়িষ্যার অঙ্কনরীতির ক্ষুদ্রাকার-

চিত্রের অলঙ্করণ এবং ভিত্তিচিত্রের বিশালত্বের সংমিশ্রণে উদ্ভূত। প্রথম চিত্র দুইটি সপ্তদশ শতকে মোগল রাজদরবারে বর্ধিত রাজসভার শিল্প-কর্মের একটি ধারা অনুযায়ী অঙ্কিত। কিন্তু মোগল প্রভাব হ্রাস পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অল্পদিনের জন্য বিদেশী লৌকিক প্রথার দ্বারা অতিক্রান্ত প্রাচীন ভারতীয় ধর্মীয় দৈব বিষয়ের অঙ্কন-রীতিই উড়িষ্যায় পুনঃপ্রচলিত হ'ল।

কালীয়দমন পটেও ক্ষুদ্রচিত্র ও প্রাচীরচিত্রাঙ্কন রীতির সংমিশ্রণ দেখা যায়। এতে জগন্নাথ বলরামের অবতার মূর্তি আর মাঝখানে সুভদ্রাকে দেখা যায়। জগন্নাথরূপী কৃষ্ণ সদ্য পরাজিত বিরাট এক সর্পের মাথায় পায়ের চাপ দিচ্ছেন ও আনন্দে নৃত্য করছেন। এটি ঊনবিংশ শতকের শেষপাদে পুরী শহরে আঁকা একটি অসম্পূর্ণ চিত্র। বিষ্ণু ও কৃষ্ণের প্রতীক একত্র সংযুক্ত করা হয়েছে। অনুজ্জ্বল মেটে লাল রঙের পশ্চাৎ পটের সামনে প্রধান মূর্তিগুলির দেহ, তথা পোষাকের হলদে রঙ সুস্পষ্ট দেখায়। জগন্নাথের মুখমণ্ডলে আর সুভদ্রার নিম্নাঙ্গে কালো রঙ দেখা যায়। জগন্নাথের হাত-পা আর বলরামের পাদপীঠ ফিকে নীল রঙে আঁকা। সাদা আর সবুজ সামান্যই ব্যবহৃত হয়েছে।

৺গোবিন্দদাসের আঁকা (১৭½" × ১৩") আকারের এই ছবিটির কল্পনাও বিরাট। নৃত্যশীল জগন্নাথমূর্তির চারিদিক ঘিরে প্রকাণ্ড সর্পরাজের পাকানো দেহটি তার গোলালো বিরাট আকারের উপর দৃষ্টি আকর্ষণ করে আর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মসৃণ সীমারেখার সঙ্গে মিলে যায়। এর অঙ্কন রীতি এতই বিভিন্ন যে অদীক্ষিতের পক্ষে দ্বিতীয় ছবিটি ও এইটি যে একই অঞ্চলের আঁকা তা বিশ্বাস করাই কঠিন।

আঙ্গুলের মনোহর অঙ্কনপ্রণালী বাংলা ও নেপালের মধ্যযুগীয় পুঁথিতে আঁকা ছবির মুদ্রার সমগোত্রীয় আর আধুনিক কাল পর্যন্ত প্রাচীন ভারতীয় রীতি টিঁকে থাকার নিদর্শন। মুকুট ও অলঙ্কার অঙ্কনের কাজে ক্ষুদ্র চিত্রের ঝোঁককেও যথেষ্ট সুযোগ দেওয়া হয়েছে। একই চিত্রকরের অন্য একটি পট-চিত্রে একটি পারাবতের পালক ইত্যাদি

এমন সূক্ষ্মতা ও নিশ্চয়তার সঙ্গে আঁকা হয়েছে যে খালি চোখে নজরেই পড়ে না। খিলানের কোণে কোণে পারাবত বা শুকপক্ষীর প্রয়োগ উড়িষ্যার ও দক্ষিণভারতীয় প্রভাবের পরিচয় দেয়।

শেষ চিত্রটি হল কন্দর্প রথ। রথে বসে আছেন কৃষ্ণ আর সুন্দরী গোপীরা নানা লীলায়িত ভঙ্গীমায় বিন্যস্ত। বিদ্যাধর ও গন্ধর্বরা নিকটেই উড়ে বেড়াচ্ছে। পিচবোর্ডের উপর অঙ্কিত চিত্রটি (৭½" × ১০½") প্রায় ত্রিশ বছর আগে মৃত, পুরী শহরবাসী শিল্পী গিরিধারীদাসের অঙ্কিত।

পাশ ফেরানো ছায়ামূর্তি, নিবিড় দেহ আর গেরুয়া, হলদে, সবুজ রঙের পরিস্ফুরণ বিংশ শতকের প্রথম ভাগের উড়িষ্যার চিত্র-শিল্পের সবিশেষ আঙ্গিক।

একটি চিত্রিত পাণ্ডুলিপি ও বাঙলার পট

১৯৪২ সালে মুর্শিদাবাদ জেলায় ভ্রমণকালে আমি সু-অলঙ্কৃত একটি 'রামচরিত-মানস' বা তুলসীদাস রচিত হিন্দী রামায়ণ দেখতে পাই।[১] আমার জ্ঞানতঃ এইটিই বাঙলায় প্রাপ্ত সম্পূর্ণরূপে চিত্রিত রামায়ণের একমাত্র পাণ্ডুলিপি। ১৫২টি বহুবর্ণের চিত্র-বিশিষ্ট ৩৪২ পৃষ্ঠার পাণ্ডু-লিপিটি শেষ কয়েকটি পৃষ্ঠা ব্যতীত আটটি কাণ্ডে সম্পূর্ণ। মেদিনীপুর জেলার মহিষাদল রাজ এস্টেটের রাণী জানকী দেবীর অধ্যয়নের জন্য দ্বিজ ইচ্ছারাম মিশ্র কর্তৃক কাগজের উপর গ্রন্থটি লিখিত; প্রতিটি সর্গের শেষে প্রদত্ত স্থান-কালাদির বৃত্তান্ত থেকে জানা যায় যে গ্রন্থটি শেষ করতে তিন বছর লেগেছিল—শকাব্দ ১৬৯৪ থেকে ১৬৯৭ (খ্রীঃ ১৭৭২-৭৫)। প্রয়াগের এই ব্রাহ্মণ খুব সম্ভবতঃ ছিলেন কুল-পুরোহিত। গ্রন্থটি তাঁর পৃষ্ঠপোষক রাণীর নৈতিক শিক্ষার জন্য হিন্দীতে লিখিত হলেও, অলঙ্করণগুলি নিঃসন্দেহে মেদিনীপুরের স্থানীয় শিল্পীদের কাজ। শেষের কয়েকটি মূল পৃষ্ঠার পরিবর্তে স্থান পূর্ণ করা হয়েছে দুর্বল হস্তাক্ষরে লিখিত কয়েকটি পৃষ্ঠা দিয়ে, এগুলি চিত্রবিহীন। চিত্রগুলির অঙ্কনশৈলীতে প্রাচীনতর ও পরবর্তী পর্যায়ের মধ্যে লক্ষণীয় পার্থক্য দেখা যায়, বোঝা যায় যে একাধিক শিল্পীকে নিযুক্ত করা হয়েছিল। প্রতিটি পৃষ্ঠায় (আকারে ৯¾" × ১২¾") লেখাগুলি মোগল পাণ্ডুলিপির অনুরূপ রঙীন পাড়ের বেষ্টনীর মধ্যে বহুবিচিত্র জ্যামিতিক নক্সা রচনা করে।

এখানে কয়েকটিমাত্র ছবির আলোচনা দেওয়া হল। প্রথম চিত্রটি হল প্রথম পৃষ্ঠার। তাতে দেখানো হয়েছে আদিকাণ্ডের প্রথম স্তবকটি। বিষ্ণুর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের জন্য নিয়মিত পরিক্রমা কালে নারদ বৈকুণ্ঠপুরীতে গিয়ে সেখানে বিষ্ণুর পরিবর্তে সিংহাসনে রামকে এবং তাঁর সঙ্গে তাঁর তিন ভ্রাতা, সীতা ও হনুমানকে দেখে বিস্মিত।

কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে তিনি শিবের শরণ নেন। শিব তাঁকে বোঝান যে বিষ্ণুর এই অদ্ভুত আত্মপ্রকাশ রাবণের অত্যাচার থেকে পৃথিবীকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে রাম অবতার রূপে পৃথিবীতে তাঁর আসন্ন জন্মগ্রহণের ইঙ্গিতবহ।

এই দৃশ্যটিতে রাম পীঠ আকৃতির এক সিংহাসনে বীরাসনে উপবিষ্ট। তাঁর পেছনে আছেন সীতা, সামনে রাজকীয় পাখা হাতে একজন অনুচর, সম্ভবতঃ লক্ষ্মণ, এবং পদতলে ভক্তিভরে উপবিষ্ট হনুমান। ভরত ও শত্রুঘ্ন অনুপস্থিত। পশ্চাদ্‌পটে দেখা যায় একটি রাজকীয় বহিরঙ্গন, তাতে তিনটি চূড়া এবং বহিঃরেখাকে ঘিরে ও তাকে অতিক্রম করে দূরে পতাকাগুলি বায়ুতে প্রচণ্ডভাবে আন্দোলিত হচ্ছে। অনুস্থাপনটি সমসাময়িক অনুরূপ এক উড়িষ্যার তালপত্র চিত্রের কথা স্মরণ করায়।[২] সীমাবদ্ধ কয়েকটি রঙ—নীল, চাপা সবুজ, গৈরিক-হলুদ ও হালকা লাল রঙের ব্যবহার একটা গম্ভীর ভাব সৃষ্টি করেছে। দুটি ও তিনটি রেখা দিয়ে ঝালরের ইঙ্গিত একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য।

অপর এক চিত্রে ভগীরথের সুপরিচিত কাহিনীটি চিত্রিত। অভিশাপের ফলে ভস্মে পরিণত ছয় হাজার পূর্বপুরুষকে গঙ্গার পবিত্র জলের স্পর্শে পুনরুজ্জীবিত করার উদ্দেশ্যে ভগীরথ প্রাণান্তকর বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও দেবী গঙ্গাকে স্বর্গ থেকে মর্ত্যে অবতরণে সম্মত করাতে সক্ষম হয়েছিলেন। ছবিতে দেখা যাচ্ছে তিনি শঙ্খ (ছবিতে শিঙা বা ভেরী রূপে প্রদর্শিত) ও ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে রথে গর্বিত ভাবে পথ দেখিয়ে আগে আগে চলেছেন, গঙ্গা বাধ্য ভাবে রথচক্রের পশ্চাতে অনুসরণ করছেন। সংশ্লিষ্ট পৃষ্ঠাটির মাঝামাঝি এই ছবিটি আছে। একটি বলিষ্ঠ অনুস্থাপনগত টানে শোভাযাত্রাটির অবতরণ ও অগ্রগতি দেখানো হয়েছে। রথের অংশে হালকা গোলাপী ও হালকা লাল রঙের প্রাধান্য, মাঝে মাঝে নীল, চাপা সবুজ ও গৈরিক হলুদ রঙের স্পর্শ। পিছন দিকে নদীর জল দেখানো হয়েছে ঢেউ এঁকে নীলের আভাসে, তাতে কতকগুলি স্তর ধীরে ধীরে মিশে গেছে ফিকে লাল ও সাদায়। ছবির

দু'টি অংশকে যুক্ত করছে হালকা লাল রঙের একটি সূক্ষ্ম রেখা।

আর একটি চিত্রে রাম ও রাবণের মধ্যে তৃতীয় দিনের যুদ্ধের একটি ঔৎসুক্যকর ঘটনা বর্ণিত। রাম ও লক্ষ্মণের সমর্থনে এই উপলক্ষে ইন্দ্র কর্তৃক বিশেষ ভাবে প্রেরিত রথটি রাবণের রথের দিকে প্রচণ্ড বেগে ধাবমান। রাবণের রথটি অশ্ববিহীন, কিন্তু মকরমুণ্ড-খচিত। অজেয় রাবণকে হত্যার জন্য রাম মরিয়া ভাবে চেষ্টা করছেন এবং তার প্রতি একটি বর্শা উদ্যত করেছেন। তিনি তার সব কয়টি মাথা ও হাত শতবার কেটে ফেলেছেন, কিন্তু প্রত্যেকবারই বিচ্ছিন্ন প্রত্যঙ্গগুলি উঠে রাবণের দেহের সঙ্গে জুড়ে যাচ্ছে। কারণ ব্রহ্মা তাকে অমরত্বের বর দিয়েছিলেন। ক্ষুদ্রদেহী প্রতিপক্ষের ব্যর্থ প্রচেষ্টার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শনরত রক্ষরাজের বিশাল চেহারা, রথগুলি, রাবণকে ঘিরে জ্যোতির্মণ্ডলের মতো ঐন্দ্রজালিক মুণ্ডের মালা, উপর দিকে লাফিয়ে-ওঠা কাটা-হাতগুলি, যুযুধান উভয় পক্ষের হিংস্র অভিব্যক্তি—এই সবই ছবিটিকে প্রচণ্ড গতিসম্পন্ন করে তুলেছে।

অপর এক ছবির বিষয়বস্তু হল অযোধ্যার পথে ভরত ও রামের আনন্দময় পুনর্মিলন। নির্বাসিত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার আকস্মিক প্রত্যাবর্তনে তাঁর পদপ্রান্তে লুণ্ঠিত দুঃখাভিভূত ভরতকে তুলে ধরার জন্য রাম সস্নেহে নিচু হয়ে আছেন। তাঁর পিছনে সীতা ও লক্ষ্মণ আশীর্বাদের ভঙ্গীতে হাত তুলে আছেন, তাঁদের পিছনে হনুমান। একটি লতানে পুষ্পিত তরু অবয়বগুলির আড়াআড়ি অনুস্থাপনকে স্পষ্টতর করেছে।

আর এক ছবিতে নির্বাসিতদের প্রত্যাবর্তনের পর পুনর্মিলনের দৃশ্যটির পূর্বানুবৃত্তির বিশদ চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে। ছবিটি পূর্ণপৃষ্ঠার, তিনটি আনুভূমিক অংশে বিভক্ত, প্রত্যেকটি অংশে কতকগুলি মানুষের দাঁড়ানো চেহারা। রামের চেহারাটি বারংবার প্রদর্শিত হয়েছে, তাঁর পরণে তখনও নির্বাসনকালীন পোশাক। রামের চেহারা তাঁর ভ্রাতৃবৃন্দ ও অন্যান্য প্রিয়জনের একেক জনের পরে পরে দেখা যাচ্ছে, তিনি তাঁদের অভিবাদন জানাচ্ছেন। উজ্জ্বল সজীব রঙে একের পর এক সংস্থাপিত

হলুদ বা গাঢ় নীল বুটিদার আলুলায়িত পোশাকে রাজকীয় ব্যক্তিদের চেহারা, এবং গাঢ় নীল কাপড় পরা অনাবৃত-দেহ হলুদ রঙের চেহারা-গুলি রামের হরিৎবর্ণ শরীরের সঙ্গে বৈপরীত্য প্রকাশ করছে।

ব্রহ্মা কর্তৃক অমরত্বের বর লাভে গর্বিত অজেয় রাবণের বানররাজ বালীর হাতে লাঞ্ছনার দৃশ্যটি আর একটি চিত্রে বলিষ্ঠভাবে প্রদর্শিত হয়েছে। বালী রাক্ষসরাজকে আঁকড়ে ধ্বস্তাধ্বস্তি করছেন, তাকে নিজের লেজে জড়িয়ে বেঁধেছেন, এবং প্রাণভরে তাকে চার সমুদ্রে নিমজ্জিত করেছেন; সমুদ্রের ঢেউয়ের ইঙ্গিত সম্ভবত করা হয়েছে ছবিটির চার পাশের প্রথাগত নক্সা দিয়ে। তীক্ষ্ণ, অমসৃণ ও আড়া-আড়ি রেখা দিয়ে দেখানো হয়েছে রাবণের শক্তিহীন দেহ ও বালীর প্রচণ্ড শক্তিধর চলমান দেহকে। উপরের বাঁকা খিলানটি ছবির একেকটি অংশের দৃঢ় গতিকে ঐক্যবদ্ধ করেছে।

ভূষণ্ডী কাক ও সে-সম্পর্কে রামের শৈশবজীবনের এক অলৌকিক ঘটনা দেখানো হয়েছে অন্য একটি ছবিতে। এখানে জলের মতো রঙের স্তর বিভাগ আকাশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়েছে।

পাণ্ডুলিপিতে মেদিনীপুরের শিল্পীদের অঙ্কনগুলি হল বঙ্গদেশের দেশজ পটশৈলীর পূর্বসূরী। তাতে অত্যধিক ওড়িশীয় প্রভাব থাকলেও এবং মোগল ও প্রাচীন ভারতীয় রীতির কথা মনে পড়লেও, লোক-শিল্পের সমস্ত উপাদানই সেখানে আছে। যেমন, কাহিনী-বর্ণনা, উজ্জ্বল স্পষ্ট রঙ, দৃঢ় তুলির টান, এবং সঙ্গে-সঙ্গে এঁকে ফেলা; মূল লেখার দেবনাগরী হরফগুলিও পৃষ্ঠাগুলির সাধারণ পরিকল্পনায় তাদের ভূমিকা পালন করছে। অবয়বগুলির রূপরেখা অঙ্কিত সাদা পশ্চাৎপটে; সেগুলি বিভিন্ন গোষ্ঠীর অংশ। মেয়েদের উঁচু খোঁপার আভাস দিয়ে তাদের মাথা-ঘিরে শাড়ির চওড়া, বঙ্কিম ঢেউ দেখে মনে পড়ে মেদিনী-পুরের সীমানার খুব কাছে উড়িষ্যার একটি করদরাজ্য ময়ূরভঞ্জে প্রাপ্ত 'অমরুশতক' পাণ্ডুলিপির অঙ্কনরীতির কথা।[৩] আকর্ণ-বিস্তৃত উপ-বৃত্তাকার চক্ষুর মিল আছে ওড়িষ্যার তাল-পাতা ও কাগজে আঁকা সম-

সাময়িক চিত্রের সঙ্গে। পশ্চিম ভারতীয় রীতিকে তা' অনুসরণ করে না। অবয়বগুলি এখানেও দেখানো হয় এক পাশ থেকে এবং সামনাসামনি। কিন্তু নমনীয়-কোমল ওড়িশীয় রূপের পরিবর্তে সেগুলি দৃঢ়সংবদ্ধ। এই অসাধারণ পাণ্ডুলিপি চিত্রমালায় ওড়িশী শৈলীর দৃঢ়তা ও প্রাণবন্তুতার সঙ্গে মিশ্রিত হয়েছে বাঙলা দেশের কোমলতার।

বঙ্গীয় শিল্প অবশ্য অতীতের ব্যাপার নয়; এ হল এক চলমান ও জীবন্ত প্রক্রিয়া। গ্রাম বাঙলার সমকালীন 'স্ক্রোল' চিত্র বা পটে দেখা যায় যে পরম্পরাগত শিল্প তার সাধারণ মানুষের উপযোগী রূপে এখনও প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রচলিত রয়েছে; পশ্চিমী ঘেঁষা শহুরে সংস্কৃতির দ্বারা তা' প্রভাবিত হয় নি। আধুনিক যন্ত্র সভ্যতার ধাক্কার মুখে পরম্পরাগত সাংস্কৃতির অন্যান্য চিহ্নগুলির মতো এটিও যে দ্রুত ক্ষীয়মাণ হচ্ছে, তা কম দুঃখের কথা নয়।

এই 'জড়ানো-পট'গুলি সাধারণ কাগজে আঁকা, সে কাগজও প্রায়শঃই সবচেয়ে সস্তা ধরনের, কখনও বা সংবাদপত্র; এর কোনটিই একশো বা দেড়শো বছরের বেশি পুরনো নয়। আশুতোষ মিউজিয়ম ও গুরুসদয় দত্তের সংগ্রহের (এ দু'টি হল ভারতের একমাত্র সাধারণ প্রতিষ্ঠান যেখানে লোকপ্রিয় শিল্পের এই নব দলিল রক্ষিত আছে) অধিকাংশ পটই গত আশি বছরের মধ্যে আঁকা। এগুলির দৈর্ঘ্য গড়ে বারো থেকে ষোল ফিটের মধ্যে; চওড়ায় এক বা দুই ফুট। বিষয়বস্তু ব্যতিক্রমহীন ভাবে ধর্মীয় এবং মহাকাব্যের কাহিনী নির্ভর; যেমন —কৃষ্ণলীলা, রামলীলা, বেহুলার উপ্যাখ্যান ও চৈতন্যলীলা। পট প্রধানতঃ পশ্চিমবঙ্গেই সীমাবদ্ধ। গাজী-পট বা গাজীর উপাখ্যান সংক্রান্ত পট পূর্ববঙ্গের কুমিল্লা ও বরিশালের মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত আছে। দশ কিংবা বারটি পৃথক পৃথক চিত্র সম্বলিত দীর্ঘ পাকানো কাগজগুলিতে ছবিগুলিকে সাজানো হয় একটির নীচে আরেকটি আয়তক্ষেত্রাকার ছবি দিয়ে; গোটানো কাগজটি আস্তে আস্তে খোলার সঙ্গে সঙ্গে এবং পটুয়াদের স্বরচিত পরম্পরাগত লোক-

গাথা সহযোগে প্রতিটি ছবির কাহিনী সুর করে শোনানোর সঙ্গে সঙ্গে পটুয়া একেকটি ছবি দেখায়।[8] আয়তক্ষেত্রাকার ছবিগুলিকে হাল্‌কা রঙে সাদা-মাটা পাড় এঁকে কিম্বা পর পর গোলাপ ফুল ও পাতা আঁকা পুষ্পময় পাড় দিয়ে পৃথক করা হয়। সেই সঙ্গে পাশাপাশি নিরবচ্ছিন্ন অলঙ্কারবহুল পাড়ের বর্ডার ছবিগুলির পারস্পরিক সম্পর্কের উপরও জোর দেয়।

বাঙলার পটগুলি কাঁথার[৫] মতো নয়। পটগুলি অল্পবিস্তর কোনো কিছু বক্তব্য বহন করে, এবং কদাচিৎ সাংকেতিক। স্পষ্টতঃই গোটানো চিত্রগুলি বর্ণনাত্মক শৈলীতে অঙ্কিত হত। প্রাচীন ভারতীয় শিল্পের কাহিনী বর্ণনার ক্ষমতা এতে রক্ষিত হয়েছে। কাহিনীর ক্রম উদ্‌ঘাটনের মধ্যে আমরা ভারহুত ও সাঁচীর অদ্ভুত রীতি-কৌশলের পুনরাবৃত্তি লক্ষ্য করি। কিন্তু পটগুলিতে অঙ্কিত মাথা দেখানো হয় এক পাশ থেকে, একটি চক্ষুর সম্পূর্ণ অংশ, দেহ সামনাসামনি, আবার পা ও পায়ের পাতা পুরো অথবা তিন-চতুর্থাংশ পাশ থেকে এবং 'অবয়ব ও তার প্রত্যঙ্গগুলির গঠন ও গতি কয়েকটি বিশিষ্ট আকৃতিতেই সীমাবদ্ধ।'

পটগুলি বলিষ্ঠ রেখা ও উজ্জ্বল বর্ণে বিশিষ্ট, যেমনটি আমরা দেখেছি তুলসীদাসের চিত্রিত রামায়ণ পাণ্ডুলিপিতে। পটুয়ারা সাধারণত শুদ্ধ বর্ণগুলির ব্যবহার করেছেন—লাল, নীল ও হলুদ। সবুজ ও পিঙ্গল বর্ণ কখনো কখনো প্রয়োগ করা হত—প্রথমোক্তটি বিশেষতঃ দুম্‌কা সাব ডিভিশনের (সাঁওতাল পরগণা) ছবিতে এবং শেষোক্তটি মানভূম জেলার ছবিতে। উভয় অঞ্চলই বিহারের অন্তর্গত কিন্তু সংস্কৃতিগতভাবে দুটিই বাঙলাদেশের অংশ।

ইণ্ডিয়ান রেড, নীল, 'burnt sienna' ও হলুদ-গিরিমাটির রঙের প্রাধান্য আছে। বর্ণ প্রলেপ দেওয়া হয় স্থূল অবলেপে। রেখার চিরায়ত ভারতীয় মণ্ডনগুণ কালীঘাটের পট ছাড়া কোথায়ও স্পষ্ট নয়।

প্রাচীনতর পাকানো ছবিতে বাইরের প্রভাব দেখা যায়। দেশজ প্রকাশভঙ্গী ও কর্মের স্বাধীনতা লক্ষ্য করা যায় শুধু সাম্প্রতিককালে

কৃত ছবিগুলিতে। শুধু পোশাক, গাছ ও পুষ্পিত পাড়ের ব্যবহারেই নয়, স্থাপত্যগত বিন্যাসেও ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিককার কিছু পটে রাজপুত প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। অপর পক্ষে, বাঁকুড়ার অন্ততঃ একটি রামায়ণ পটে মুঘল প্রকাশভঙ্গী পরিষ্কারভাবে লক্ষ্য করা যায়। পটটির রচনাকাল সম্ভবতঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ। তাতে প্রায় সমস্ত ছাঁদটিই এবং বর্ণ পরিকল্পনা মুঘল ভাবধারার কথা মনে পড়ায়। রামের বরযাত্রায় দৃশ্য যে পটটিতে দেখানো হয়েছে তা স্থানবণ্টন, গতি ও বস্তু বিন্যাসের দিক থেকে মূঘল বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন।

বিভিন্ন জেলায় পশ্চিমবঙ্গের পটে নকশা ও রঙের অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। আগেই বলা হয়েছে যে সাঁওতাল পরগণায় সাদা পশ্চাদ্‌পটে সবুজ, নীল ও হলুদ রঙে আবছা অবয়বই পছন্দ করা হয়। মানভূমের পট সহজেই চেনা যায় একটি নির্দিষ্ট রঙের প্রতি তাদের পক্ষপাত থেকে—'burnt sienna'। তাকে ফুটিয়ে তোলা হয় সাদা ও হলুদ পোঁচ দিয়ে এবং তার অনুস্থাপন ঘনসন্নিবিষ্ট। মেদিনীপুরের গোটানো পটে অসংখ্য অবয়ববিশিষ্ট 'প্যানেল'গুলিতে বিশদ অলঙ্করণ থাকে, দৃশ্যগুলিকে পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে আঁকা হয়, তবু এই সব ছবিতে উপর দিকে উপবিষ্ট অবয়বগুলি মনে রেখাপাত করে এবং আকৃতিতেও বিরাট। প্রণিধানযোগ্য যে বীরভূম-বাঁকুড়াও ব্যতিক্রমহীন ভাবে পছন্দ করে ইণ্ডিয়ান রেড পশ্চাদ্‌পট এবং হুগলী পছন্দ করে ঘন পিঙ্গল বর্ণ। তাছাড়া হুগলীর পটগুলির বিমূর্ত রেখাগত ব্যবহার অদ্ভুত। প্রতিবেশী হলেও বাঁকুড়া ও বীরভূমের ছবির মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে। প্রায়শই পুষ্প অঙ্কিত কাপড় বা ঝালরের বিনুনীর মতো ভাঁজে রেখার স্বল্প ব্যবহার বাঁকুড়ার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য এবং এর প্রচলন প্রাচীনতম কাল থেকেই। অধিকন্তু তীক্ষ্ণ ও কৌণিক পার্শ্বাগত চেহারা ছাড়া মাথার অনুস্থাপন কদাচিৎ অন্য কোন ভাবে হয়। অপরদিকে বীরভূম পছন্দ করে মাথার তিন-চতুর্থাংশ দৃশ্য রূপ। বীরভূমের পটুয়া অপর যে অনন্য বৈশিষ্ট্য প্রয়োগ করেন তা হল প্রথাগত যুগ্ম

ভ্রূ। এইগুলি এবং অন্যান্য অনেক প্রবণতা ও শৈলীগত উপাদান বহু জেলার ছবি চেনার কাজে সাহায্য করে।

বিভিন্ন ধরনের পটের কতকগুলি বিশদ দিক এখন পরীক্ষা করে দেখা হবে। প্রথমে নেওয়া যাক পঞ্চাশ বছরেরও আগের আঁকা বাঁকুড়ার রামায়ণ পটের (আশুতোষ মিউজিয়ম সংগ্রহ) দুটি 'প্যানেল'। উপরের দৃশ্যে দেখানো হয়েছে রাম, তাঁর সঙ্গে বিভীষণ, সুগ্রীব, লক্ষ্মণ ও হনুমান; তাঁরা রাবণের বিরুদ্ধে বিজয়ের প্রাক্কালে দেবী দুর্গাকে পূজা করছেন। সাদামাটা আঁকা একটি জায়গার পশ্চাদ্‌পটে দেবীর ভারী অবয়ব দৃশ্যটিতে প্রাধান্য বিস্তার করে আছে তাঁর আকস্মিক আবির্ভাব ও প্রাণবন্ত অঙ্গভঙ্গী নিয়ে, বৈপরীত্য উপস্থিত করেছে তার উভয় পার্শ্বের অবয়বগুলির কঠোর ঊর্ধ্বাধঃ ভঙ্গী। দেবীর দশ হস্তের গতি ও বিন্যাস অনুসৃত হয়েছে রাম এবং তাঁর অনুচরবৃন্দের মাথাগুলির অর্ধবৃত্তাকার উপস্থাপনে। মঙ্গল কলসের দ্বারা বিভক্ত দুটি সুস্পষ্টরূপে পৃথক দলের বিপরীতধর্মী গতি সরল অথচ কার্যকর অনুস্থাপনটির ভারসাম্য বজায় রেখেছে। রামের জীবনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি মুহূর্ত এখানে এক নাটকীয় চিত্রায়ন লাভ করেছে।

নিচের 'প্যানেলে' দেখানো হয়েছে রামের বানর মিত্র ও রাক্ষসদের মধ্যে যুদ্ধের একটি দৃশ্য। ছবিটি গতি সম্পন্ন কর্মতৎপরতায় পূর্ণ—কোন পটুয়া অন্য কোন জায়গায় একে ছাড়িয়ে যেতে পারে নি। অগ্রসরমান দুটি বিরাটাকৃতি বানর—একটি সাদা অপরটি ঘোর নীল—একটি ত্রিভুজের দুটি বাহু তৈরী করেছে, কালচে লাল জমিনের উপর জটিল এক নক্‌সা বোনা হয়েছে, হালকা রঙের বিপ্রতীপে ব্যবহার করা হয়েছে ঘোর রঙ। লড়াইয়ের গণ্ডগোলে সৈন্যদের বিবদমান দল-গুলিকে আলাদা করে বেছে নেওয়া দুরূহ কাজ: এক জটপাকানো অবস্থায় সবাই মিলে গেছে, কেউ তেড়ে আসছে, কেউ বা পলায়মান, প্রধান লড়াই থেকে কিছু দূরে এখানে ওখানে চলছে একক লড়াই। মানুষগুলি কল্পনীয় সবরকম ভঙ্গীতেই রয়েছে—দৌড়ানো, দাঁড়িয়ে

থাকা, নতজানু, গুটিসুটি মেরে থাকা কিংবা লড়াইয়ের মাঝখানে আবার শত্রুর সম্মুখীন হবার জন্য দ্রুত ঘুরে দাঁড়ানো। যে ফাঁকা জায়গাগুলি আছে তাও ভরাট করা হয়েছে ছিন্ন মুণ্ড ও কাটা হাত-পা দিয়ে।

বীরভূমের শক্তি-পটে (ব্যক্তিগত সংগ্রহ) একটি গোলাকার চালচিত্র দেবী দুর্গার ঋজু গতিভঙ্গীকে নিয়ন্ত্রণ করছে; দেবী এক 'অতি-মানবীয়' সিংহ ও পদানত অসুরের উপর আরূঢ়, তাঁর দুই পাশে লক্ষ্মী, সরস্বতী, গণেশ ও কার্তিকেয়, পশ্চাদ্‌পটে কতকগুলি স্তম্ভ।

এখানে অবয়বটি বাঁকুড়ার পটের মতো নয়। দুর্গা এখানে দীর্ঘকায়া এবং পিরামিডাকৃতি পাদস্তম্ভের উপর আসীন। পশ্চাদ্‌-পটের ঢেউখেলানো ঝালরগুলি অসংখ্য হাতের সমান্তরাল গতির সঙ্গে এক সংগতি রচনা করেছে এবং ঊর্ধ্বাধঃ স্তম্ভগুলি নক্‌শার অজস্র বঙ্কিম রেখার বৈপরীত্য প্রকাশ করে। চারিদিকে মোটা রেখায় ঘেরা দেবীর নীল বস্ত্র দেবী অবয়বের উপর বিশেষ জোর দেয়, অন্য সমস্ত অবয়ব-গুলিকে গৌণ করে তোলে। ছবিটি যাতে প্রাণশক্তিতে স্পন্দিত হয় সে উদ্দেশ্যে নীল, ইণ্ডিয়ান রেড, হলুদ, হলুদ-গিরিমাটি, সবুজ ও সাদা রঙ দক্ষতার সঙ্গে প্রয়োগ করা হয়েছে।

আশুতোষ মিউজিয়ম সংগ্রহে মেদিনীপুরের একটি বেহুলা পটে দেখা যায় সাদা জমির উপর বঙ্কিম রেখায় ঘেরা হালকা নীল রঙের নক্সা। পটটিতে স্থান-ব্যবহার ও কারুকুশলতার প্রমাণ পাওয়া যায়।

মেদিনীপুরের কৃষ্ণলীলা-পটটি তার অনুস্থাপনের জন্য উল্লেখযোগ্য। পটটিতে দেখা যায় বৃন্দাবনে কৃষ্ণের অলৌকিক কার্যকলাপের দৃশ্য—অঙ্কিত ছবির বিভাগগুলিকে কেটে মাঝামাঝি জায়গা দিয়ে যমুনা নদী বিসর্পিল গতিতে বয়ে চলেছে। অতিক্রমকারী গাভী ও বকাসুরের ডানা ছবির অংশগুলিকে পরস্পরসংযুক্ত করেছে। নদী দেখাবার এই অদ্ভুত ভঙ্গী সাঁচীর একটি তোরণে প্রস্তর উৎকীর্ণ নিরঞ্জনা নদী ও মহাকপিজাতক উপস্থাপনের শুঙ্গ রীতির কথা স্মরণে আনে।

সাঁওতাল পরগণার দুম্‌কা থেকে প্রাপ্ত কৃষ্ণলীলামূলক একটি

গোটান ছবিতে (আশুতোষ মিউজিয়ম সংগ্রহ) দুধের পাত্র মাথায় নিয়ে একই ভঙ্গীতে অগ্রসরমান তিনটি গোয়ালিনীর ছবি চমৎকার এক দৃশ্য উপস্থিত করে। ছবিটি মাত্র কয়েকবছর পূর্বে অঙ্কিত এবং ঘটনাটির তাৎপর্য কম নয়। সাদা পশ্চাদ্‌পটে তীক্ষ্ণ, সুস্পষ্ট বহিঃরেখার পাড় রচিত হয়েছে পর পর কতকগুলি বিন্দু দিয়ে। এ বৈশিষ্ট্য অন্যত্র লক্ষ্য করা যায় না। অবয়বগুলির দৃঢ় বেলনাকার নিম্নাংশ হাতগুলির চক্রাকার এবং চমৎকার ভাবে মাথার চারিদিকে ঘুরিয়ে শাড়ী পরিধানের ভঙ্গীর ভাব রক্ষা করে। এরূপ অবয়ব শুধু মেদিনীপুরের ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলির সাঁওতাল শিল্পকর্মেই দেখা যায়। শাড়ীর সবুজ রঙের সঙ্গে শরীরের হলুদ রঙ ও সবুজ কাঁচুলি—মাঝের মূর্তিটির কাঁচুলির রং হালকা গোলাপী লাল—চমৎকার ভাবে মিলেছে।

আশুতোষ মিউজিয়ম সংগ্রহে বর্ধমান জেলার কীর্তনের দৃশ্য সংবলিত পটে অধিকতর পরিশীলিত অঙ্কনরীতি লক্ষ্য করা যায়। চৈতন্যের ভাবাবিষ্ট মূর্তি সম্মুখ ও পশ্চাতের সারির কেন্দ্রে রয়েছে। ইণ্ডিয়ান রেড জমিনের উপর হলুদ-গিরিমাটির গাত্রবর্ণ দীপ্তিময়। পিঙ্গল বর্ণের বাদ্যযন্ত্র (মৃদঙ্গ) বর্ণ পরিকল্পনায় গভীরতা দান করেছে। মসৃণ বঙ্কিম রেখায় অঙ্কিত এবং আন্দোলিত অঙ্গ প্রত্যঙ্গের দ্বারা বিভক্ত দৃঢ় সুগোল দেহগুলি এক তীব্র ভাবাবেগগত মনোভাবের ছন্দোময় পরিবেশ রচনা করেছে।

গ্রন্থপঞ্জী

১. পাণ্ডুলিপিটির অধিকারী সাধকবাগের বিখ্যাত বৈষ্ণব আখড়ার মোহান্ত শ্রীবলরামদাস আউলিয়াকে আমি রাজী করাতে পেরেছিলাম, তিনি যাতে পাণ্ডুলিপিটি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'আশুতোষ মিউজিয়ম অব ইণ্ডিয়ান আর্ট'কে উপহার দেন। এই উল্লেখযোগ্য এবং মূল্যবান উপহারের জন্য আমি মোহান্ত মহাশয়ের কাছে কৃতজ্ঞ।

২. J. I. S. O. A., Vol IX. 1941, Pl. XV.

৩. J. I. S. O. A., Vol. VIII. 194u, Pl. V. 3.
৪. গুরুসদয় দত্ত, The Indigenous Painters of Bengal, J. I. S. O. A., Vol. 1., P 21.
৫. J. I. S. O. A., Vol. I, Pls. IV, V, Fig. 1 & 2.

বাঙলার পট

সকলেই জানেন বোধহয় যে দীনেশচন্দ্র সেন ও গুরুসদয় দত্তই প্রথম বাঙলার অবহেলিত গ্রামীণ শিল্প ও কারুকার্যের প্রকৃত মূল্য নির্ধারণ করে দেশের লোকের সামনে ধরেন। সেজন্য তাঁরা আমাদের বরেণ্য ও প্রণম্য। তবে একথাও মনে রাখবেন, গ্রামীণ শিল্পের অমূল্য উপাদান হিসাবে সংগৃহীত পটগুলি তাঁদের ব্যক্তিগত সংগ্রহের মধ্যে আবদ্ধ ছিল, একরকম লোকচক্ষুর অন্তরালেই। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ মিউজিয়মই ভারতবর্ষে প্রথম বাঙ্গলা ও উড়িষ্যার পট তথা সমগ্র লোকশিল্পের নিদর্শনকে সমাদরে স্থান দেয় সর্বসাধারণের উপভোগের জন্য। লোকশিল্পের অনন্য সংগ্রহ আশুতোষ মিউজিয়মের একটি বিশিষ্ট অঙ্গ ও গৌরবের বস্তু। দেশীয় সংগ্রহশালার মধ্যে আশুতোষ মিউজিয়ম শুধু এ বিষয়ে অগ্রণী নয়, গত পঁয়ত্রিশ বছর ধরে লোকশিল্প, বিশেষ করে বাঙ্গলার পটের বিচিত্র ঐশ্বর্য শুধু বিদগ্ধ জনের জন্য নয়, জনসাধারণের শিক্ষা ও উপলব্ধির জন্য নানাভাবে —সম্যক প্রদর্শনী, বক্তৃতামালা, রচনাবলী ও গবেষণার মাধ্যমে প্রচার করবার চেষ্টা করে চলেছে। সেজন্য সম্প্রতি বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ও সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীতে বাঙলার পটের প্রকৃত রূপ জানবার জন্য যে আগ্রহ ও চেতনা জেগেছে তার জন্য আমি বাস্তবিক আনন্দিত। দত্ত মহাশয়ের অমূল্য সংগ্রহগুলিও ঠাকুরপুকুরে গুরুসদয় মিউজিয়মে রক্ষিত হওয়ায় গ্রামীণ শিল্পের রূপ জানবার যথেষ্ট অবকাশ পেয়েছে জনসাধারণ।

গোড়াতেই আমি পটের ঐতিহ্য নিয়ে কিছু বলতে চাই। অনেকেরই ধারণা পট—ও' তো সেদিনের জিনিস—একশো বছর আগে পটের কোন চিহ্নই নেই, আর বাঙ্গলার পটুয়াদের ওটা নিজস্ব সম্পত্তি, অন্য কোনও দেশে প্রচলিত ছিল না বললেই হয়। অনেকেই হয়তো শুনে আশ্চর্য

হবেন যে দু'-চারশো বছর নয়, আড়াই হাজার বছর আগে থেকে ভারতবর্ষের নানা জায়গায় জড়ানো ও চৌকাপট জনসাধারণের শিক্ষা, চিত্তবিনোদন ও বিভিন্ন ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হতো, সেটা ক্রমশঃ আমরা জানতে পেরেছি। কয়েক বছর আগে এ বিষয়ে অনুধাবন করতে গিয়ে আশ্চর্য হয়েছিলাম একটি তথ্য আবিষ্কার করে। জৈন তীর্থঙ্করের জীবনী থেকে আমি দেখতে পাই যে খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর অধিবাসী বুদ্ধ ও মহাবীরের সমসাময়িক গোশাল মঙ্খনিপুত্ত নিজে শুধু আজীবিক সম্প্রদায়ের খ্যাতনামা প্রতিষ্ঠাতাই ছিলেন না, তিনি ছিলেন নালন্দা গ্রামের একজন সামান্য পটুয়া 'মঙ্খে'র পুত্র। 'পাণিমঙ্খ' মানে 'পটকার', 'পট্টিকার' বা পটুয়া, পট দেখানই যাদের জাত ব্যবসা। সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণের আগে পর্যন্ত তিনি পৈত্রিক ব্যবসা অবলম্বন করে জীবিকা উপার্জন করতেন, পট দেখিয়ে নানা জায়গায় ঘুরে ঘুরে।

এছাড়াও পট ও পটুয়াদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আশ্চর্যজনক প্রমাণ পাই খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে লেখা পাণিনি'র 'অষ্টাধ্যায়ী' থেকে। পাণিনি পরিষ্কার ভাবেই তখনকার কালের দুই শিল্পীগোষ্ঠীকে আলাদা স্পষ্ট অভিহিত করেছেন---(১) 'গ্রামশিল্পী', যারা কেবলমাত্র গ্রামের লোকেদের প্রয়োজন মত ছবি আঁকেন বা মূর্তি তৈরী করেন, (২) 'রাজশিল্পী', অর্থাৎ কাশিকা কথিত রাজানুগ্রহপুষ্ট শিল্পী যারা রাজার আদেশমত বা অভিরুচি অনুযায়ী কাজ করেন। পাণিনির এই সুস্পষ্ট নির্দেশ থেকে বেশ বুঝতে পারি দুই শিল্পরীতির চলন ছিল একই সময়ে পাশাপাশি এবং এই থেকেই সহজে বুঝতে পারি মহারাজ অশোকের মৌর্য ভাস্কর্য ও শুঙ্গযুগের ভারহুতের ভাস্কর্যের মধ্যে সম্পূর্ণ বিপরীত রীতির কারণ। শুধু তাই নয়, 'পতঞ্জলি' তাঁর মহাভাষ্যে বিশেষভাবে বর্ণনা দিয়েছেন রাস্তার ধারে কি ভাবে লোকশিল্পীরা কংসবধের পালা চিত্রিত পটের সাহায্যে দেখাচ্ছেন। বৌদ্ধ ও জৈন সাহিত্যে এই শ্রেণীর শিল্পীকে 'শৌভিক' বা 'শোভনিক' আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

সম্প্রতি শান্তিনিকেতন 'কলাভবনে'র উদ্যোগে অনুষ্ঠিত পটুয়া সম্মিলনীতে পঠিত 'পট ও পটুয়া' প্রবন্ধে শ্রদ্ধেয় বিনোদবিহারী মহাশয় জৈন পরম্পরার সঙ্গে পটচিত্রের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ উল্লেখ করে বলেছেন বৌদ্ধ চিত্ররীতিতে এটি অতি দুর্লভ। মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের এই অনুমান কিন্তু সত্য নয়। বৌদ্ধ সাহিত্যে ও শিল্পে পটচিত্রের প্রভাব ও উল্লেখ আমরা যথেষ্ট পাই। 'বুদ্ধচরিত'-এর এক জায়গায় আছে যে একবার ভগবান বুদ্ধ 'চরণচিত্র' নামে পরিচিত একটি আলেখ্যের বিশেষ প্রশংসা করেন। বুদ্ধঘোষ তাঁর ভাষ্যতে এর ব্যাখ্যা করে বলেন যে 'চরণচিত্র' সেই ধরনের চিত্র যা শুধু শিল্পীর ভাবকল্পনাদীপ্ত নয়, যাতে দেখতে পাওয়া যায় বিভিন্ন ছবি একের 'চরণে' অর্থাৎ নিম্নে ক্রমিক ভাবে সাজান। এখানে আমরা সুপ্রাচীন 'চরণচিত্রে'র সঙ্গে আধুনিক পট-চিত্রের আশ্চর্য মিল পাই। শুধু তাই নয় খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় ও প্রথম শতাব্দীর ভারহুত ও সাঁচীর বিখ্যাত তোরণস্তম্ভে আমরা পাই জাতক ও বুদ্ধকাহিনীবহুল চতুষ্কোণক্ষেত্র বিশিষ্ট ভাস্কর্যের পারস্পরিক বিন্যাসে ফুটে উঠেছে চরণচিত্রের বিশিষ্ট আঙ্গিক ও আভাস। এগুলিকে চরণ-চিত্রের শিলাসংস্করণ বলা যেতে পারে অনায়াসে। আর একরকম শায়িত গোটানো পটচিত্রেরও আমরা উজ্জ্বল প্রতিচ্ছবি পাই ভারহুত ও সাঁচীর তোরণশীর্ষে তিনটি সমান্তরাল খিলানে, গল্পের নিরবচ্ছিন্ন ধারা রক্ষা করে সূক্ষ্ম কারুকার্য মণ্ডিত আয়তক্ষেত্রগুলিতে ও তাদের আবর্ত-খচিত গোটানো প্রান্তভাগে, যেমন করে আজকালকার পটুয়ারা পট দেখান খানিকটা খুলে খানিকটা গুটিয়ে রেখে। আমরা পরের যুগেও পটচিত্র ও যমপটের বিবিধ উল্লেখ পাই কালিদাসের রচনাবলীতে, বাণভট্টের 'হর্ষচরিতে', ভবভূতির 'উত্তররামচরিতে' এবং বিশাখদত্তের 'মুদ্রারাক্ষসে'। সপ্তম শতাব্দীতে রচিত হর্ষচরিতে কবি সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন তখনকার সময়ে এই চিত্রাভিনয়ের ও তার জনপ্রিয়তার। বর্ণনায় পাই পিতা প্রভাকরবর্ধনের সাংঘাতিক পীড়ার খবর পেয়ে হর্ষবর্ধন শিকার বাসনা ত্যাগ করে ত্রস্তভাবে থানেশ্বরপুরীতে ফেরবার

সময় রাস্তায় দেখতে পান একজায়গায় একটি দোকানের সামনে ছেলেদের খুব ভীড়—জনৈক পট্টিকার গান গেয়ে বাঁ'হাতে বাঁশে ঝোলানো একটি যমপট দেখাচ্ছেন এবং ডানহাতে একটি বেতের ছড়ি দিয়ে ভীষণাকৃতি মহিষারূঢ় যমরাজের ছবির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন; ঠিক যেমন আজকালকার দিনে বাঙ্গলার গ্রামে গ্রামে পটুয়ারা যমপট দেখিয়ে গান গেয়ে বেড়ান। আরও আশ্চর্যের কথা এই যে আধুনিক বাঙলার পটুয়াদের মত প্রাচীন ভারতের পট্টিকারও একাধারে ছিল কবি, শিল্পী, গায়ক ও প্রদর্শক।

অনেকে আমাকে জিজ্ঞাসা করেছেন, বেশীর ভাগ জড়ানো পটকে 'যমপট' বলা হয় কেন? একথা অনস্বীকার্য যে আবহমান কাল থেকেই এই ধরনের পট প্রচলিত ছিল ভারতবর্ষের নানা প্রদেশে ও অঞ্চলে। এবং বহুপূর্বেই অষ্টম শতাব্দীতে লিখিত বিশাখদত্তের সংস্কৃত অভিনয় গ্রন্থ 'মুদ্রারাক্ষসে' এর বোধহয় সর্বপ্রথম উল্লেখ পাই। সেখানে দেখি একটি গুপ্তচর যমপট নিয়ে ঘর থেকে নিক্রান্ত হবার সময় বলছেন, 'যমে চরণে প্রণাম কর, কারণ তুমি অন্য দেবতার দ্বারা উপকৃত হবে না। তিনি অন্য সব দেবতাদের ধ্বংস করেন, তিনি সন্তুষ্ট হলে তাঁর ভক্তদের জীবন রক্ষা পায়। তিনি জগতের ধ্বংস-কারক তাঁর আশীর্বাদে আমরা দীর্ঘজীবী হই। তাই ঘরে প্রবেশ করে যমের ছবি (যমপডং) দেখিয়ে আমি তার গান গাই।' সুতরাং এখানে যমপটের প্রকৃত রূপ ও তাৎপর্য ও বিশেষ করে 'যমপডং' কথার ব্যবহার আমরা পাই। জীবনের অনিত্যতা ও যমের অপরিহার্য প্রতাপের কথা বাণভট্ট 'হর্ষচরিতে' ইঙ্গিত করেছেন। সেখানে যমের ছবি দেখিয়ে পট্টিকার সেই শাশ্বত দার্শনিক তত্ত্ব বুঝিয়ে গাইছেন সুললিত কণ্ঠে, সহস্র সহস্র মাতাপিতা ও শতশত স্ত্রীপুত্র যুগে যুগে জন্মাচ্ছে ও তিরোহিত হচ্ছে—কিন্তু কে তোমার, আর তুমিই বা কার? যেমন আধুনিক পটুয়া বাঙলার গ্রামে গ্রামে পট দেখিয়ে শেষকালে যমরাজার গান করে পাপ-পুণ্য ও পরজীবনে যমের হাতে যৎপরোনাস্তি

নিগ্রহের কথা শুনিয়ে দর্শকের মনে জাগাতে চেষ্টা করে সৎ ও অসৎ কর্মের ফলাফল ও ঐহিক জীবনের নশ্বরতা সম্বন্ধে চেতনা। এইজন্যই মনে হয় প্রত্যেক পটের শেষে, সে কৃষ্ণলীলা সংক্রান্তই হোক, রাম-লীলা সংক্রান্তই হোক, বা মনসা, চণ্ডী বা চৈতন্যলীলা সংক্রান্তই হোক ভীষণাকার যমরাজ ও ভূতপ্রেত অধ্যুষিত যমালয়ের একখানি জীবন্ত ছবি জুড়ে দেওয়া হয়, তাই এর নাম 'যমপট'।

প্রাচীন ভারতে ও বহির্ভারতে পটের ব্যাপক ব্যবহারের দৃষ্টান্ত কেবলমাত্র সাহিত্যে ও ধর্মশাস্ত্রে পাই না, এর চাক্ষুষ প্রমাণ পাই অভাবনীয় ও অপ্রত্যাশিত ভাবে ভারতের বাইরে সুদূর মধ্য এশিয়ার চৈনিক তুর্কিস্থানে কুচা অঞ্চলে অবস্থিত কিজিল গুহার ভিতরে আনু-মানিক খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে অঙ্কিত বৌদ্ধ ভিত্তি চিত্রে। বৌদ্ধগাথায় পাই বুদ্ধদেব মহাপ্রয়াণ করেছেন কুশীনগরে, কিন্তু কে সাহস করে বুদ্ধের একান্ত শরণাগত মগধাধীশ মহারাজ অজাতশত্রুকে এই নিদারুণ সংবাদ জানাবেন। সেজন্য তাঁর প্রখরবুদ্ধি মন্ত্রী বর্ষকর এই উপায় বার করলেন। দুঃসহ বেদনার আঘাত লাঘব করবার জন্যে প্রথমে বিরাট কুম্ভের মধ্যে অজাতশত্রুকে গলিত ননীর মধ্যে স্নান করিয়ে, স্নায়ুমণ্ডলীকে শান্ত করিয়ে তবে ক্রমশঃ এই সংবাদ কৌশলে উদ্‌ঘাটন করলেন রাজসমক্ষে। চিত্রে আমরা দেখতে পাই বিচিত্রভাবে এই রোমাঞ্চকর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। সম্রাট কুম্ভের মধ্যে প্রবিষ্ট, সামনে নির্বাক বর্ষকর ভয়ে ভয়ে ধরে আছেন একটি চতুষ্কোণ বস্ত্রখণ্ড, তাতে আঁকা রয়েছে চারকোণে বুদ্ধজীবনীর চারটি প্রধান ঘটনাবলী—যথাক্রমে জন্ম, মারবিজয়, ধর্মচক্রপ্রবর্তন ও মহাপারিনির্বাণ এবং শেষটি দেখেই সম্রাট সব বুঝতে পেরে বিলাপ করছেন দুই হাত তুলে। এই অনবদ্য ও অসামান্য ভিত্তিচিত্রে একটি বিশেষ জিনিস লক্ষ্য করবার আছে। দু'টি ভিন্ন দেশের চিত্রশৈলীর একই জায়গায় পাশা-পাশি সন্নিবেশ। মহারাজা অজাতশত্রু ও তাঁর মন্ত্রীর অঙ্কনের প্রকাশ-ভঙ্গিতে পাই ইরাণদেশীয় তুখারীয় আঙ্গিকের যথেষ্ট প্রভাব কিন্তু

সামনে বিস্তৃত পট সম্পূর্ণ ভারতীয় রীতিতে অঙ্কিত। রেখাত্মক এই ছবিতে দেখে আশ্চর্য হই ভারতীয় রেখা-রচনার সাবলীল গতি দেহ-গঠনের সুকুমার সুললিত মাধুর্য এবং সর্বোপরি গুপ্তযুগের অজন্তার প্রাণ-চঞ্চল তরঙ্গায়িত বিচিত্র ছন্দ। এই চিত্র দেখে মনে হয় সিংহল, আফ-গানিস্থান, তুর্কীস্থান, চীন, কোরিয়া ও জাপানে ও পূর্ব-দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে ভারতীয় চিত্রশৈলীর যে সুস্পষ্ট প্রভাব বিদ্যমান তার মূল উৎস ভ্রাম্যমাণ যাত্রী ও শিল্পী সংগৃহীত সম্পূর্ণ ভারতীয় রীতি-উদ্ভাসিত লঘুভার এইরকম পটখণ্ড ও পুঁথি। কিজিল ভিত্তিচিত্রের এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত এই অভূতপূর্ব পটের সর্বপ্রাচীন চাক্ষুষ দৃষ্টান্ত থেকে পটের আসল রূপও ধরতে পারা যায়। সংস্কৃত কথা 'পট্ট' থেকে উৎপন্ন 'পট' একখণ্ড চিত্রিত বস্ত্র মাত্র। আগেও যা ছিল এখনও তাই আছে। খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতেও সিংহলের রাজপথে উৎসব উপলক্ষে টাঙানো বুদ্ধের ছবি আঁকা কাপড়ের পট দেখতে পান বিখ্যাত চৈনিক পরি-ব্রাজক ফা-হিয়েন।

হিন্দুরাজত্বের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে চিত্রকরদের অধঃপতন ঘটে। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের মতে ব্যতিক্রম দোষে চিত্রকরগণ ব্রহ্মকোপহেতু ব্রহ্মশাপে পতিত হন। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ আনুমানিক ১৩শ খ্রীষ্টাব্দে লেখা। সুতরাং দেখা যায় যে কারণেই হোক মুসলমান আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে পটুয়া সমাজে বিপ্লব ঘটে, ধর্মান্তর গ্রহণও স্বাভাবিক। মনে হয় সেই সময় থেকেই ইসলাম ধর্মের আওতায় আসায় পটুয়াদের সমাজচ্যুতি এবং সামাজিক অবনতির আরম্ভ। তবে মধ্যযুগে মুসলমান রাজত্বের সময় বাঙলা দেশে পটের চল কিছু কম ছিল মনে হয় না। আমার মনে হয় মুর্শিদাবাদ জেলার জিয়াগঞ্জ থেকে আমি যে তুলসীদাসের রামচরিতমানসের পাণ্ডুলিপিটি আশুতোষ মিউজিয়মের জন্য সংগ্রহ করেছিলাম তা'তে পাই আধুনিক বাঙলার পটশৈলীর প্রাচীনতম প্রকাশ। ইংরাজ রাজত্বের প্রারম্ভে এই সুঅলঙ্কৃত পুঁথিটির রচনাকাল ১৬৯৪ থেকে ১৬৯৭ শকাব্দের অর্থাৎ ১৭৭২-৭৫ খ্রীষ্টাব্দের

মধ্যে ; ৩৪২ পৃষ্ঠাব্যাপী এই বৃহৎ পুঁথিতে আছে ১২৫টি মনোহর রঙীন ছবি। রামায়ণটি মেদিনীপুর অন্তর্গত মহিষাদলের রানী জানকীর প্রীত্যর্থে যদিও সভাকবি প্রয়াগের ব্রাহ্মণ দ্বিজ ইচ্ছারাম মিশ্র হিন্দীতে সুন্দর হস্তাক্ষরে লিখেছিলেন, ছবিগুলির অপূর্ব কলাকৌশল কিন্তু নিঃসন্দেহে তৎকালীন মেদিনীপুরবাসী লোকশিল্পীর হাতের। দেখলেই মনে হয় অধুনা মহিষাদল, সূতাহাটা, আমদাবাদ, নাড়াজোল প্রভৃতি স্থানের পটুয়াদের পূর্বপুরুষের স্বাক্ষর এতে আছে। ছবিগুলির কোনো কোনো জায়গায় মুঘল শিল্পরীতির শেষ স্বাক্ষরেরও পরিচয় পাই কিছু কিছু। আরও আমার মতে এই যুগসন্ধির কালে আঁকা, লণ্ডনের ভিক্টোরিয়া অ্যাণ্ড এলবার্ট মিউজিয়ম সযত্নে রক্ষিত বিচিত্র বর্ণোজ্জ্বল রামায়ণ পট'টি আধুনিক জড়ানো পটের সবচেয়ে পুরোনো নমুনা। খণ্ডিত পট হলেও এটি একটি অমূল্য সম্পদ। ঘটনাবলীর মধ্যে কয়েকটি ছোটবড় 'প্যানেল' আছে যথাক্রমে জটায়ুবধ, রামের সীতাহরণ বিলাপ, জটায়ু-এর শবদাহ, সুগ্রীবের রামলক্ষ্মণের সঙ্গে মিত্রতা ও বালিবধ। জমির রঙ অষ্টাদশ শতাব্দীর পটচিত্রের মত টকটকে লাল কিন্তু অন্যান্য ব্যাপারে বিভিন্ন রূপ ও রঙের প্রতিফলনে পাই দেশীয় লোকশিল্পরীতি, মুঘল ও রাজস্থানী শিল্পরীতির অদ্ভুত সংমিশ্রণ—'ট্র্যানজিশনাল পিরিয়ডে' যে রকম স্বাভাবিক রঙ হয়ে থাকে। মানুষগুলি পটের ধরনে ক্ষিপ্রহস্তে আঁকা, সূক্ষ্ম ফুলকারী নক্‌শা ও পাখীগুলি মুঘল শিল্প অনুযায়ী প্রকৃতি-বাদী, গাছগুলি রাজপুত ধাঁচের, ঘরবাড়ীগুলি আবার মুঘল স্থাপত্যের ছায়া অবলম্বনে রচিত। আরচর প্রভৃতি পণ্ডিতেরা মনে করেন এর বয়স ১৮২০ সালের কাছাকাছি। কিন্তু আমার মতে এটি আরও পুরানো—অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পাদে একে অনায়াসে ফেলা যেতে পারে। কারণ মানুষগুলির কাঠামো যদিও মেদিনীপুরের পুঁথির মতো নয়, তবুও জল ও আগুনের অবাস্তব রূপ হুবহু উপরোক্ত রামচরিত-মানস পুঁথির ছবির মত। তখনকার পটের চলিতভাষায় ব্যক্ত, এই অপূর্ব পটটি যে মুর্শিদাবাদেরই পটুয়াদের আঁকা তা নিঃসন্দেহে প্রকাশ পায়

এর বিশিষ্ট শৈলীতে ও রূপসজ্জায়।

বক্তব্য শেষ করার আগে একটি বিষয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। এ পর্যন্ত বাঙলায় পট নিয়ে যা আলোচনা হয়েছে তার মধ্যে পটের আঞ্চলিক আঙ্গিক ও বিশেষত্ব নিয়ে আলোচনা খুবই কম হয়েছে। ত্রিশ বছর আগে ১৯৪২ সালে 'ইনডিয়ান সোসাইটী অব্ ওরিয়েণ্টাল আর্ট' পত্রিকায় আমি প্রথম এই বিষয়ের অবতারণা করি। তুলসীদাসের রামায়ণ ও বাঙ্গলার পট সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধে আমি বিভিন্ন জেলার পটগুলির রঙ ও রেখা বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছিলাম যে চলিতভাষার উচ্চারণে যেমন বিভিন্ন জেলায় নিজস্ব প্রকাশভঙ্গী আছে ঠিক তেমনই আছে বিভিন্ন জেলায় পটের চিত্রশৈলীর মধ্যে, আঁকার পদ্ধতির আঙ্গিকে ও টানেটোনে। মানভূম, মেদিনীপুর, হাওড়া, বর্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম, ফরিদপুর, বরিশাল এবং সাঁওতাল পরগণার পটের মধ্যে আশ্চর্যভাবে নিজ নিজ জেলার বিশেষ অভিব্যক্তি আছে রঙের ব্যঞ্জনায়, রেখার প্রয়োগে, পশুপক্ষী লতাপাতার অলঙ্করণে, মানব ও দেবতার আকৃতিতে ও বিষয়বস্তুর সমাবেশে। যাতে দেখলেই সহজে বোঝা যায় কোন্ পট কোন্ অঞ্চলের। কিন্তু এ বিষয়ে আরও গভীর ভাবে আলোচনা হওয়া দরকার।

আগে আমাদের ধারণা ছিল পট ও পটুয়া বুঝি বাঙলাদেশের একান্ত নিজস্ব সম্পদ, বাইরে খুঁজলেও কোথাও পাওয়া যায় না। কিন্তু প্রথমেই বলেছি প্রাচীন ভারতের বিভিন্ন সময়ে ও প্রদেশে পটের চল ছিল ধর্মপ্রচার, নীতিমূলক গল্পের ও সাধারণ জনশিক্ষা ও চিত্তবিনোদনের বাহন হিসাবে প্রচুর পরিমাণে। জৈন, বৌদ্ধ ও হিন্দুরা নির্বিচারে পট ব্যবহার করতেন নানা উদ্দেশ্যে, নানা ভাবে, ভারতে এবং বহির্ভারতে। খুব পুরোনো না হলেও তারই প্রমাণ স্বরূপ গত কয়েক বছরের অনুসন্ধানে ভারতের লোকশিল্পের পরিচায়ক অনেক আঞ্চলিক পটের নিদর্শন সংগৃহীত হয়েছে—কাপড়ে আঁকা, কাগজে নয়—রাজস্থানের যোধপুর, জয়পুর ও উদয়পুর থেকে, গুজরাট থেকে, মহারাষ্ট্রের পৈথান থেকে

অন্ধ্রদেশের ওয়ারাঙ্গল ও নলগোণ্ডা থেকে, উড়িষ্যার বিভিন্ন জেলা থেকে ও দক্ষিণে তাঞ্জোর থেকে। এর মধ্যে নামদ্বারের ‘পাবুজী-কা-পড়্’ ও গুজরাট ও রাজস্থানের জৈন পটগুলি সমধিক প্রসিদ্ধ। আভিজাত্যপুষ্ট, সর্বজনপ্রিয় মধ্যযুগের রাজস্থানী কলমের ছবিগুলি ও লোকশিল্পের পারস্পরিক ধারার পরিচায়ক রাজস্থানের স্থানীয় পটগুলির মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। আশুতোষ মিউজিয়মের সংগ্রহের মধ্যে আছে কতকগুলি রাজস্থানী ও গুজরাটী স্থানীয় পট, আছে উড়িষ্যার অগণিত ধর্মভিত্তিক চৌকাপট। বারাণসীর ‘ভারত কলাভবনেও’ কয়েকখানি আধুনিক পুরীর পট আছে। কিন্তু বাঙলার জড়ানো পটের সঙ্গে কেবলমাত্র তেলেঙ্গানার জড়ানো পটের অদ্ভুত মিল আছে। বিশেষত ‘চরণচিত্রের’ ধারা অনুযায়ী ছবিগুলির একের পর এক ক্রমবিন্যাসে লম্বা-লম্বিভাবে। প্রাচীন ‘প্রতিষ্ঠানপুর’ বা পৈথানের পট এখন লুপ্তপ্রায়। পুণার কেলকার মিউজিয়মে পৈথান পটের ১৫০ খানি শেষ নিদর্শন রক্ষিত আছে। লোকশিল্পের দৃষ্টিভঙ্গী, বর্ণের ঔজ্জ্বল্য, রেখার ক্ষিপ্রগতি ও বিষয়বস্তুর নাটকীয় সমাবেশ—সবই পাওয়া যায় এই ধরনের পটে। স্বভাবতই অবস্থানহেতু এই পটগুলিতে ধরা পড়ে রাজস্থানের ‘পাবুজী-কা-পড়্’, গুজরাটের জৈন চিত্রাবলী ও দক্ষিণ-ভারতের বিজয়নগরের ভিত্তিচিত্রের অনস্বীকার্য প্রভাব। এককালে বাঙলা দেশেরই মত মহারাষ্ট্রের গ্রামে গ্রামে বেড়িয়ে বেড়াত চিত্রকথী’রা, রামায়ণ, মহাভারত ও লোকগাথার বিভিন্ন কাহিনীবহুল পিঠোপিঠি লাগান চৌকাপটগুলি দেখিয়ে গান করে গ্রামবাসীদের মুগ্ধ করে। মহারাষ্ট্রের ‘চিত্রকথী’ শব্দটিও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

সকলেই জানেন ভারতীয় শিল্প সভ্যতা ও সংস্কৃতি যুগ যুগ ধরে প্রবাহিত মধ্য পন্থা অবলম্বন করে। আধুনিক ভারতীয় শিল্পের ক্ষেত্রেও বাঙলার পটের স্থায়ী অবদান কম নয়। চিরাচরিত পদ্ধতি ছাড়াও বাঙলার পটের মধ্যে সমতাজ্ঞান আজকালকার নবীন চিত্রশিল্পীদের প্রণিধানযোগ্য। বাঙলার পটে নেই রবিবর্মার উৎকট বাস্তব বিলাসিতা।

নেই অতি আধুনিক বিমূর্ত শিল্পের অপরিমেয় বিচ্যুতি ও বিকৃতি। কিন্তু আছে বাস্তব ও কল্পনার মধুর ও সরল সামঞ্জস্য রঙ, রেখা ও অভিব্যক্তির আতিশয্যকে পরিহার করে।

হাজার হাজার বছরের ঐতিহ্যপূর্ণ ভারতীয় শিল্প ও কৃষ্টির এই যে পট-এর ভবিষ্যৎ কি একেবারেই অন্ধকার? গরীব পটুয়ার একমাত্র আশ্রয় ক্রমবিলীন এই গ্রামীণ ভাবভঙ্গী অনুপ্রাণিত শিল্পকলার কি বাঁচবার কোনই সম্ভাবনা নেই, কোন সার্থকতাই নেই পারিপার্শ্বিক ধর্মালস, যান্ত্রিক সমাজের আবহাওয়ার মধ্যে?

পূর্ব ভারতের আদিবাসী ধাতুশিল্প

আলোচ্য প্রবন্ধটি পূর্বভারতের আদিবাসী সম্প্রদায়ের আবহমান-কাল ধরে প্রচলিত রীতিপদ্ধতির ধাতুশিল্প সম্পর্কে আলোচনা। বন্য প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে লালিত আদিম সম্প্রদায়ের এই ধাতুশিল্প তার কলাকৌশল, ধারণাশক্তি এবং সৌন্দর্যবোধের প্রতি আবেদনের জন্যেই প্রসিদ্ধি লাভ করে আজও অবিনশ্বর হয়ে রয়েছে। বিদেশীয় প্রভাবে অনুপ্রাণিত উন্নাসিক গঠনরীতির শিল্পকর্মের যে রেওয়াজ আজকাল চালু হয়েছে—এর বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হলে, প্রথমেই দরকার ভারতের এই বিমূর্ত হস্তশিল্পের উৎপাদনকে বাঁচিয়ে রাখা। গঠন ও কারুকর্মের উৎকর্ষতামণ্ডিত এই অসামান্য বোধটি গড়ে ওঠার মূলে আছে এই যাযাবর আদিম সম্প্রদায়ের পরিবেশ ও তার প্রাচীন ঐতিহ্যের অবদান।

এই সম্পর্কে লক্ষণীয় যে, পূর্ব এবং মধ্যভারতের আদিবাসী ধাতু-শিল্প নির্মাণে যে আদিম বংশগত ধাতুশিল্পীরা (যাঁরা সাধারণতঃ 'কর্মকার' বলে পরিচিত) নিয়োজিত আছেন—তাদের বাসভূমি হোল বিন্ধ্য ও পূর্বঘাট পর্বতমালার এক বিস্তীর্ণ জঙ্গলাবৃত অংশে, যার সীমানা হোল পরস্পর সংশ্লিষ্ট বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, উড়িষ্যা এবং মধ্য-প্রদেশ। মুখ্যত শিল্প সৃষ্টিই এদের জীবিকা এবং এজন্য তাদের দুঃখ, দারিদ্র ও অবজ্ঞার সঙ্গে একটানা সংগ্রাম করে যেতে হচ্ছে। এই আদিবাসী ধাতুশিল্পীরা সাধারণতঃ 'ঢোক্‌রা' নামেই পরিচিত। পশ্চিম-বাংলার পুরুলিয়া, বীরভূম, বাঁকুড়া, বর্ধমান ও মেদিনীপুর জেলায় এদের পরিচয় 'ঢেপ্পো' নামে, বিহারে 'মালর' নামে (পশ্চিমবাংলার মালো সম্প্রদায় এবং দক্ষিণ-ভারতের 'মাল' সম্প্রদায়ের সঙ্গে খুবই সামঞ্জস্যপূর্ণ 'মাল' শব্দটি মনে হয় অস্ট্রিক শব্দ জাত—যা 'উচ্চভূমি' অর্থে মালভূমি) এবং দক্ষিণাঞ্চলের জেলাগুলির মধ্যে পালামৌ, হাজারিবাগ,

রাঁচী, সাঁওতাল-পরগণা, ধানবাদ ও সিংভূমের চতুর্দিকে ছড়িয়ে থাকা এই সম্প্রদায়কে স্থানীয়ভাবে বলে 'ঘুংঘুর ধাড়া' বা কখনো বলা হয় 'ঘণ্টরা'; উড়িষ্যাতে এদের বলা হয় 'সিথ্‌রিয়া' এবং মধ্যপ্রদেশের বস্তারে এদের নাম 'ঘড়ুয়া।' মনে হয় তাদের আসল বাসভূমি মধ্য-প্রদেশের দণ্ডকারণ্যের পার্বত্যসঙ্কুল গভীর জঙ্গল থেকে এরা যাযাবরের মতন নানাস্থানে ছড়িয়ে পড়েছে। তারপরে উক্ত চারটি প্রদেশের সীমানা বরাবর গ্রামগুলিতে এরা এদের ভ্রাম্যমাণ কারখানা নিয়ে বসবাস করে বা ঘুরে বেড়ায়। সুতরাং এদের শিল্পকর্মে আদিবাসী ধ্যানধারণার প্রভাব খুব বেশী পরিমাণে পড়েছে এবং এই ঢোক্‌রা সম্প্রদায় যে উপায়ে তাদের মূর্তি ও তৈজসপত্র নির্মাণ করে থাকেন—তা 'সিরে পাড্ড্য' পদ্ধতি বলেই পরিচিত। প্রাচীন শিল্পশাস্ত্রে এই পদ্ধতিকে বলা হয়েছে 'মধুচ্ছিষ্টবিধানম্'। এতে মোম বা ধূনোর আঁঠা দিয়ে প্রথমে মূর্তির ছাঁচ তৈরী হয়, তারপর ওই ছাঁচটিকে নরম মাটি দিয়ে আবৃত করে কোন একটি নির্দিষ্ট ছিদ্রের মধ্যে গলানো পিতল ঢেলে দেওয়া হয়। মোম বা ধূনোর আঁঠা গলে বের হয়ে আসে—আর তার স্থানে পিতলের অংশ স্থানলাভ করে। এই পদ্ধতিতে ঢোক্‌রারা যে ধাতুমূর্তি নির্মাণ করেন—তাতে এক নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের ছাপ থাকে, যা অন্যান্য লোকশিল্প থেকে একেবারেই স্বতন্ত্র।

এদের সম্পর্কে এক চমকপ্রদ তথ্য প্রসঙ্গতঃ দেওয়া যেতে পারে এবং তা' হোল, ভারতের ৩৪টি প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান খনন করে হরপ্পা পরবর্তী যুগের (খ্রীঃ পূঃ ১৭০০-১০০০) যে সব তামা ও ব্রোঞ্জের দুষ্প্রাপ্য অস্ত্রশস্ত্র ও সাজসরঞ্জাম এবং নরধর্মী (anthropomorphic) বস্তু পাওয়া গেছে, সেই সব বিস্তীর্ণ অঞ্চল হোল উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, অন্ধ্রপ্রদেশ, বিহার, উড়িষ্যা এবং পশ্চিমবঙ্গ। বিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক স্যর মর্টিমার হুইলার এই সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন যে, এই সব তামার অস্ত্রশস্ত্র ও নানারকম সাজসরঞ্জামের বিশেষ গড়ন, সুনিপুণ ঢালাই এবং পেটাই-এর কাজ দেখে এবং জঙ্গলের প্রায় আটশো মাইল এলাকা

জুড়ে এই বস্তুগুলির প্রাপ্তিগত বিস্তার দেখে স্বচ্ছন্দেই বলা যেতে পারে যে এইসব খনন-কাজ থেকে পাওয়া ঐ বস্তুগুলি সম্ভবতঃ (পৃথিবীর অন্য দেশের মতই) ভবঘুরে দক্ষ শিল্পীগোষ্ঠীর দ্বারাই নির্মিত হয়েছিল। (**Wheeler : Civilizations of the Indus Valley and Beyond, p.p. 93-97**) সুতরাং এ থেকে একটা আশ্চর্য সম্পর্কের অনুমান করা মোটেই অসঙ্গত নয় যে, পূর্বভারতের তাম্রপ্রস্তর যুগের এই সব যাযাবর ধাতুশিল্পীরা এবং তাদের বংশধর (?) বর্তমান কালের এই যাযাবর ঢোক্‌রারা হয়ত একই অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন।

আলোচ্য ঢোকরাদের জীবন ও শিল্প সম্বন্ধে অন্য একজন বিদেশী বিশেষজ্ঞ রুথ্‌ রীভস্‌ ভারতবর্ষের হস্তশিল্পের প্রাচীন গৌরব ও তার ধারাবাহিকতার মূল কোথায়—সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে মন্তব্য করেছেন যে, ভারতের নব্যপ্রস্তর যুগের অধিবাসীরা যে বাঁশ ও বেতের সাহায্যে গৃহনির্মাণ করতেন, আজও গ্রামাঞ্চলে গৃহ নির্মাণের জন্যে এই সব দ্রব্যই ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে এবং এর পরবর্তীকালে দেখা যাচ্ছে, বসতবাড়ী ও মন্দির নির্মাণের কাজে প্রথমে কাঠ এবং পরে পাথর ব্যবহৃত হচ্ছে। এ ছাড়া নব্যপ্রস্তর যুগের অধিবাসীদের ব্যবহৃত যে সব জিনিষ পাওয়া গেছে তাতে অনুমান করা যেতে পারে যে, কাঁচামালের প্রাচুর্যের জন্যই তারা এই সব বাঁশ ও বেতের জিনিষপত্র, ঘাসের তৈরী ঝোড়া, ফাঁদ এবং মাদুর প্রভৃতি নির্মাণ করতে সক্ষম হয়েছিল। (**Ruth Reeves : Cire Perdue Casting in India p. 14**)

ভারতের তথা বাংলার লোকশিল্প বিশেষজ্ঞ শ্রীসুধাংশুকুমার রায় এই মতেরই সমর্থন করে বলেছেন যে, বিভিন্ন গড়নের এই সব বস্তুর মধ্যে যে উদ্ভিদের আকৃতি লক্ষ্য করা যায় তাতে এই কথাই প্রমাণ করে যে, ধাতুশিল্প যুগের বাঁশ ও বেতের সাহায্যে তৈরী মূর্তি ও তৈজসপত্রের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের 'কাঁইকুইয়া মাল', 'যাদু পটুয়া' অথবা 'ঢেপ্পো'দের তৈরী মূর্তিগুলির এক অদ্ভুত সাদৃশ্য বিদ্যমান। আসলে ধাতু ব্যবহারের

বহু পূর্ব থেকেই এই সব ধর্মীয় যাদুবিশ্বাসসঞ্জাত মূর্তিগুলি নির্মিত হতো বেত ও বাঁশ দিয়ে। কেননা খুবই ভালভাবে এদের তৈরী জিনিষগুলি নিরীক্ষণ করলে দেখা যাবে, ধাতুনির্মিত হলেও এগুলির মধ্যে বাঁশ ও বেতের বুনুনির কাজ স্পষ্ট বিদ্যমান। আসলে দেখা যাচ্ছে, গোড়ার দিকে বাঁশ ও বেতের সূক্ষ্ম কাঠির বুনুনি দিয়ে তৈরী মূর্তির একটা ছাঁচ তৈরী করে তারপর ধাতু দিয়ে ঢালাই করে ('সিরে পাদ্যু" পদ্ধতি মত) মূর্তি করা হোত। আর সেজন্যেই এইসব মূর্তির গঠনভঙ্গিমার মধ্যে বাঁশ ও বেতের কাজের এত স্পষ্ট প্রভাব পড়েছে। (S. K. Roy (1) 'The Artisan castes of West Bengal, and their craft' p-303 (2) Primitive statuettes of West Bengal Journal of Arts & Crafts, January 1939. pp. 1-8)

আবার কোন কোন গবেষকের মতে, এদের তৈরী মূর্তির গায়ে 'স্ক্রু'র পাকের মত যে পেঁচানো চিহ্ন থাকে, তা' প্রভাবিত হয়েছে শঙ্খের পেঁচালো রেখা থেকে অথবা লতানে গাছের পাকানো ডগার মতো আকৃতি থেকে। অতএব এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, গোটা পূর্ব-ভারত জুড়ে আদিবাসীদের সৃষ্ট জিনিষগুলি এই গঠনপদ্ধতি ও অঙ্কন-সজ্জার সমতা অনুপ্রাণিত হয়েছে উদ্ভিজ বস্তু, যথা বাঁশ ও বেতের কাজ থেকে এবং এইসব কাজের নিদর্শন তাই দেখতে পাওয়া যায় প্রাক্-আর্য যুগের আদিবাসী সমাজের নিজস্ব বাসভূমি বিন্ধ্য-পর্বতমালা থেকে পূর্বঘাট পর্বতমালার বিস্তৃত বনাঞ্চলের মধ্যে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে বেশ কয়েক বৎসর আগে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত আশুতোষ মিউজিয়মের জন্য বর্তমান লেখক কর্তৃক মধ্য-প্রদেশের বস্তার (দণ্ডকারণ্য) থেকে দন্তেশ্বরীর এক ধাতুমূর্তি সংগৃহীত হয়। মূর্তিটি নিরীক্ষণ করার কালে খুবই বিস্ময় লাগে এই দেখে যে, মূর্তির যে হস্তীবাহন আছে তার গায়ে অনেক গাছ-গাছড়ার চিহ্ন বর্তমান। এ ছাড়া তার পাগুলো ঠিক বাঁশের গাঁটের মত সোজা; বেত দিয়ে বোনা জিনিষের মত পেঁচানো আকারের কানগুলি, এমন

কি মাথাটিকেও ঠিক যেন বাঁশে বোনা কুলোর ধরনে আকার দেওয়া হয়েছে। এছাড়া, খাড়াভাবে অবস্থিত শুঁড়ের মধ্যেও সেই উদ্ভিজ্জ বৈশিষ্ট্য রয়েছে—দেখতে যেন বাঁশের পাবের মত—যা' উড়িষ্যা ও পশ্চিমবঙ্গের হস্তীমূর্তিগুলোর ঢেউ খেলানো শুঁড়ের বিপরীত। সুতরাং বলা যেতে পারে, বস্তারের এই মূর্তিটির আকৃতির মধ্যে প্রচলিত রীতি-পদ্ধতি ও গঠনশৈলীর যে প্রভাব বিদ্যমান তা' পাশাপাশি অন্যান্য প্রদেশের সভ্যতার ছোঁয়াচ লাগা শিল্পকর্মের মধ্যে পাওয়া যায় না। বোধ হয় এর একমাত্র কারণ হোল, আধুনিক সভ্যতার ছোঁয়াচ থেকে অনেক দূরবর্তী দুর্গম বনাঞ্চলের মধ্যে এই শিল্পসাধনায় শিল্পীরা একান্ত নিমগ্ন ছিলেন বলেই এই অসামান্য শিল্পসৃষ্টির অনুপ্রেরণা লাভ করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

দ্বিতীয় পর্যায়

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে, সিংহল-ব্রহ্মে, শ্যাম-মালয়ে, চম্পা-কম্বোজে, সুমাত্রা-জাভায়, চীন-জাপানে ও মধ্য-এসিয়া-আফগানিস্থানে ভারতের অতীত ইতিহাসের অনুশীলন যতই হইতেছে ততই নব নব তথ্য উদ্‌ঘাটিত হইতেছে এবং তাহার রহস্যময় কাহিনী সকলকে বিস্ময় ও পুলকে স্তব্ধ করিয়া দিতেছে। বর্তমান ভারতে, বৃহত্তর ভারতের চর্চা আরম্ভ হইয়াছিল সর্বপ্রথম বঙ্গদেশে। এখনও বঙ্গদেশ এ-বিষয় সর্ব-প্রধান অগ্রণী। প্রায় একশত বৎসর পূর্বে এক হাঙ্গেরীয় পণ্ডিত বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটির উৎসাহে তিব্বতীয় ভাষার অনুশীলন আরম্ভ করেন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ ভাগে বাঙালী পণ্ডিত ও পরিব্রাজক শরৎচন্দ্র দাসের তিব্বতীয় ভাষা ও ধর্মের অমূল্য গবেষণা সর্বজনবিদিত। এই সময়েই এসিয়াটিক সোসাইটির আনুকূল্যে অন্য দুই বিখ্যাত বাঙালী ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপালী বৌদ্ধধর্মের আলোচনা আরম্ভ করেন।

ইহার পরে, বোধ হয় ১৩১৯ সালে পণ্ডিতপ্রবর অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় 'সাহিত্য' পত্রিকায় 'সাগরিকা' প্রবন্ধে পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে ভারতীয় সভ্যতা ও শিল্প-প্রভাবের কথা প্রথম অবতারণা করেন। গৌড়ীয় শিল্পের উৎপত্তি ও দ্বীপপুঞ্জের শিল্পকলার সহিত মৈত্রেয় মহাশয় প্রায় পঁচিশ বৎসর পূর্বে যে সম্বন্ধ পরিকল্পনা করিয়াছিলেন তাহা আজ আংশিক ভাবে সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। তৎপরে ১৯২০ সাল হইতে প্রসিদ্ধ শিল্প সমালোচক অর্ধেন্দ্রকুমার গাঙ্গুলী সম্পাদিত বিখ্যাত 'রূপম্' পত্রিকায় বৃহত্তর ভারতের শিল্প ও সাধনা সম্বন্ধে বহু তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। ১৯১৯ সালে মহামতি স্যর আশুতোষের উদ্‌যোগে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে মাদ্রাজের অধ্যাপক এস্. কৃষ্ণস্বামী

আয়েঙ্গার মহাশয় 'Some Contribution of South India to Indian Culture' নামে যে সুচিন্তিত বক্তৃতাবলী দান করেন তাহাতে তিনি পূর্ব দ্বীপপুঞ্জে এমন কি চীনদেশ পর্যন্ত দক্ষিণ ভারতের সভ্যতা বিস্তৃত হইয়াছিল, তাহার বিশেষ বিবরণ প্রদান করেন। সমুদ্রপারের ভারতের প্রথম বাঙালী পর্যটক ডঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচী। ১৯২২ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃত্তি পাইয়া আচার্য সিলভাঁ লেভির সঙ্গে ইউরোপের পথে ইন্দোচীনের প্রাচীন হিন্দুকীর্তিগুলি দেখিবার পরম সৌভাগ্য ইহার হয়। ১৯২৪ সালে কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ, শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু, ডঃ কালিদাস নাগ ও শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন সমভিব্যাহারে আহূত হন চীন ও জাপানে। ফিরিবার পথে ডঃ নাগ ইন্দোচীন ও জাভা পরিদর্শন করিয়া আসেন। ঐতিহাসিক অনুসন্ধান মানসে ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার ও বিজনরাজ চট্টোপাধ্যায়ও কয়েক বৎসরের মধ্যে যবদ্বীপ ও শ্যামদেশ ভ্রমণ করিয়াছেন। ১৯২৮ সালে পুনরায় রবীন্দ্রনাথ, অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, শিল্পীদ্বয় সুরেন্দ্রনাথ কর ও ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্মণকে সঙ্গে লইয়া যবদ্বীপ ও বলিদ্বীপ গমন করিলেন। দেড় হাজার বৎসর পূর্বেকার কুমারজীব ও গুণবর্মণ এতদিন পরে আবার মূর্ত হইয়া উঠিল ভারতের সাধনা ও সভ্যতার পতাকা লইয়া কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের এই দুই অভিযানে।

বোরোবুদুর ও এঙ্কোর-ভাটের প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হইয়া দেশে ফিরিয়া অধ্যাপক নাগ মহাশয়ের অদম্য উৎসাহে ও চেষ্টায় কলিকাতায় ১৯২৬ সালে স্থাপিত হইল 'বৃহত্তর ভারত পরিষদ' (Greater India Society)। এই পরিষদের শাখা সকল এখন ভারতময় বিস্তৃত। এই পরিষদের প্রধান কর্মী ডঃ নাগ[১], শ্রীযুক্ত অর্ধেন্দ্রকুমার গাঙ্গুলী[২], ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার[৩], ডঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচী[৪], ডঃ বিজনরাজ চট্টোপাধ্যায়[৫], ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়[৬], ডঃ উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল[৭] ও ডঃ নিরঞ্জনপ্রসাদ চক্রবর্তী[৮] মহাশয়গণ কর্তৃক বৃহত্তর ভারতের সভ্যতার বিবিধ রূপ লইয়া লিখিত পুস্তক ও

পুস্তিকাসকল দেশে ও বিদেশে সর্বসাধারণের আদৃত। এই পরিষদের তরুণ কর্মীদের মধ্যে শ্রীনীহাররঞ্জন রায়[৯], শ্রীহিমাংশুভূষণ সরকার[১০] ও বর্তমান প্রবন্ধ লেখকের[১১] নাম উল্লেখযোগ্য। শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতীর পৃষ্ঠপোষকতায় পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী, অধ্যাপক প্রভাত-কুমার মুখোপাধ্যায়[১২] ও অধ্যাপক ফণীন্দ্রনাথ বসুও[১৩] বৃহত্তর ভারত সম্বন্ধে অনেক গবেষণা করিয়াছেন। পরিষদ হইতে নিয়মিত ভাবে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হইতেছে; ইহা আশা ও উন্নতির লক্ষণ। নৃত্যশিল্পের দিক দিয়াও বাঙালী শিল্পী উদয়শঙ্কর প্রাচীনভারত ও বহির্ভারতের নৃত্যভঙ্গী উদ্ধার করিয়া কয়েক বৎসরের মধ্যে পাশ্চাত্য জগৎকে চমৎকৃত করিয়াছেন।

কিন্তু বৃহত্তর ভারতীয় জ্ঞান ও গবেষণার জন্য আমরা প্রধানতঃ ফরাসী ও ডাচ্ পণ্ডিতগণের নিকট ঋণী। গত পঁচিশ-ত্রিশ বৎসর ধরিয়া শ্যামে ও ইন্দোচীনে ফরাসীগণ এবং সুমাত্রা যবদ্বীপ প্রমুখ দ্বীপ-মালায় ডাচ্গণ পুরাকীর্তি উদ্ধার ও সংরক্ষণের জন্য যে অসামান্য পরিশ্রম ও অর্থব্যয় করিয়াছেন তাহা বাস্তবিকই প্রশংসনীয়। ইন্দো-চীনে ফরাসী প্রচেষ্টার কেন্দ্র হইতেছে ১৯০১ সালে স্থাপিত হ্যানয়ের প্রাচ্যবিদ্যাপীঠ (**Ecole Francaise d'Extreme Orient, Hanoi**)। প্রতিবৎসর এই বিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তিকা বা **Bulletin** আধুনিক নানা আবিষ্কার ও গবেষণা প্রবন্ধে পূর্ণ থাকে। যে সকল ফরাসী আচার্য বৃহত্তর ভারত লইয়া আলাপ করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে লেভি (**Levi**), ফুশে (**Foucher**), ফিনো (**Finot**), পেলিও (**Pelliot**), শাভান (**Chavannes**), পারমঁতিয়ে (**Permentier**), মাস্পেরো (**Maspero**), সেদেস্ (**Coedes**), ও পসিলুস্কি (**Przyluski**) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যবদ্বীপে ডাচ্প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগ (**Netherlands Indies Archaeological Service**) ও ব্যাটেভিয়ান সোসাইটির সাহায্যে এই অঞ্চলের পুরাকীর্তির গবেষণা ও সংরক্ষণ চলিতেছে। ডাচ্ আচার্যগণের মধ্যে কার্ণ (**Kern**), ক্রোম

(Krom), বশ্ **(Bosch)**, ফোগেল **(Vogel)**, স্টুটারহাইম **(Stu-tterheim)** প্রভৃতির নাম স্মরণীয়। হল্যাণ্ডের লাইডেন হইতে কার্ণ বিদ্যাপীঠের আনুকূল্যে ১৯২৬ হইতে প্রকাশিত বাৎসরিক তালিকা-গুলি **(Annual Bibliography of Indian Archaeology, Kern Institute)** ভারতীয় ও বৃহত্তর ভারতীয় ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক তথ্যের অতি আধুনিক ভাণ্ডার স্বরূপ। লণ্ডনের 'ইণ্ডিয়া সোসাইটি'র নূতন পত্রিকাও বৃহত্তর ভারতের শিল্প সাহিত্য বিষয়ক অতি আধুনিক নিবন্ধে পূর্ণ। অতীত ভারতের যে গৌরবময় পৃষ্ঠা এতদিন আমাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল এবং গত ২৫।৩০ বৎসর ব্যাপী পাশ্চাত্য ও প্রতীচ্য পণ্ডিতগণের অক্লান্ত পরিশ্রমে যাহার বিষয় কিঞ্চিৎ জ্ঞানের উন্মেষ হইয়াছে, আমরা নিম্নে তাহারই সামান্য সন্ধান দিতে চেষ্টা করিব।[১৪]

বহির্ভারতের পথ

সমুদ্রপারে বিভিন্ন দ্বীপে ও প্রদেশে ভারতীয় উপনিবেশের বিস্মৃত ও রোমাঞ্চকর কাহিনী আলোচনা করিবার পূর্বে দুইটি কথা জানা দরকার। একটি ভারতবর্ষের কোন্ কোন্ স্থান হইতে ঔপনিবেশিকগণ কোন্ পথ ধরিয়া এসিয়ার দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল এবং দ্বিতীয়টি, কোন্ সময় এই ঔপনিবেশিক প্রচেষ্টার আরম্ভ ও সমাপ্তি হইয়াছিল।[১৫]

প্রাচীন আর্য ও দ্রবিড়গণ জল স্থল দুই পথ অবলম্বন করিয়া বহি-র্ভারতে অভিযান করিতেন। পূর্ব পশ্চিম দুই উপকূল হইতেই সমুদ্রপথ ব্যবহৃত হইত। অতি প্রাচীন কাল হইতেই বাণিজ্য চলিত বঙ্গদেশের উপকূল এবং সুদূর প্রাচ্যের মধ্যে। মহাজনক জাতকে চম্পা ও সুবর্ণ-ভূমির উদ্দেশ্যে সমুদ্রযাত্রার কথা লেখা আছে। সুদূর পাটলীপুত্র ও বারাণসী নগর হইতে যাত্রীগণ জল বা স্থলপথ দিয়া বাংলার প্রধান বন্দর তাম্রলিপ্তিতে (তমলুক) উপনীত হইয়া অর্ণবপোতে পূর্ব দ্বীপ-

মালায় যাইতেছেন—ইহাও দেখা যায়।

এইরূপ বাণিজ্যপথের প্রচলন ছিল কলিঙ্গের উপকূল ও সুদূর প্রাচ্যের মধ্যেও। গ্রীক ভৌগোলিক টলেমি (Ptolemy) ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। গঞ্জামের সমুদ্রতটে গোপালপুরের নিকট হইতে পোতসমূহ যাত্রা করিয়া বঙ্গোপসাগর অতিক্রম করিত। পেরিপ্লাস (Periplus) হইতে ইহাও জানিতে পারা যায় যে মসুলিপটমের নিকটে তিনটি বন্দর হইতে আরও একটি বাণিজ্যপথ এসিয়ার পূর্ব উপদ্বীপ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ভরুকচ্ছ (ব্রোচ) হইতে আরম্ভ করিয়া পশ্চিম উপকূল বাহিয়া পূর্ব উপদ্বীপ পর্যন্ত অন্য একটি জলপথের কথা সুস্‌সোদী জাতকে পাওয়া যায়।

সুতরাং পূর্ব দ্বীপমালা, বঙ্গ, উড়িষ্যা, মান্দ্রাজ ও গুজরাটের উপকূলের মধ্যে বাণিজ্যপথের অস্তিত্ব সম্বন্ধে দ্বিধা করিবার কিছু নাই। সুদূর প্রাচ্য বা দক্ষিণ-পূর্বের ভারতীয় ঔপনিবেশিকগণের মাতৃভূমি যে ভারতের এই সব অঞ্চলেই অবস্থিত ছিল তাহা তাহাদের মধ্যে প্রচলিত প্রবাদ হইতে জানিতে পারা যায়। প্রথমতঃ পাই বাঙালী রাজপুত্র বিজয়ের সিংহল-অভিযানের কাহিনী। দ্বিতীয়তঃ প্রবাদানুসারে মালয় উপদ্বীপে 'লিগোর' প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল অশোকের এক বংশধরের দ্বারা। কথিত আছে, তিনি মগধ হইতে পলায়ন করিয়া উড়িষ্যার বন্দর দন্তপুর হইতে জাহাজে আরোহণ করিয়া দুর্বিপাকে মালয় উপদ্বীপে উপস্থিত হন। যবদ্বীপে সংরক্ষিত কথাকাহিনী হইতে জানা যায় যে কলিঙ্গ হইতে হিন্দুগণ যাইয়া ঐ দ্বীপে উপনিবেশ স্থাপন করে। আন্ধ্র-কলিঙ্গ হইতে ঔপনিবেশিকগণের আসার কথা অন্যান্য দ্বীপেও শুনিতে পাওয়া যায়। বস্তুতঃ ভারতীয় ঔপনিবেশিক ইতিহাসে কলিঙ্গ প্রদেশ হইতেই সর্বাপেক্ষা প্রবল ঔপনিবেশিক ধারা নিঃসৃত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। তাহার সবিশেষ প্রমাণ, এখনও মালয় হইতে ফিলিপাইন পর্যন্ত সমগ্র দ্বীপপুঞ্জে আধুনিক ভারতীয় বণিকগণ সকলেই জাতিবর্ণনির্বিশেষে ক্লিং (কলিঙ্গ শব্দের অপভ্রংশ) নামে অভিহিত। ব্রহ্মদেশের পুরান পুঁথি

হইতে ইহাও জানা যায় যে এককালে নিম্নব্রহ্মের পেগুপ্রদেশ 'উস্‌স' (ওড্র বা উড়িষ্যা) এবং প্রাচীন প্রোমনগরী 'শাক্‌সেৎ' (শ্রীক্ষেত্র = পুরী) নামে পরিচিত ছিল। ব্রহ্মের উপকূল অংশ নাম ধারণ করিয়াছিল কলিঙ্গরট্ট বা কলিঙ্গরাষ্ট্র। সুতরাং কাঞ্চীর পল্লবগণ ও বাংলার পাল-গণের অভ্যুদয়ের বহু পূর্বেই আন্ধ্র-কলিঙ্গগণ সমুদ্রের পরপারে বৃহত্তর ভারতের সূচনা করিয়াছিল।

এই কথাগুলি মনে রাখিলে সিংহল, ব্রহ্ম, শ্যাম, চম্পা, কম্বোজ, সুমাত্রা ও যবদ্বীপে আবিষ্কৃত প্রাচীনতম কতকগুলি ভাস্কর্যের নিদর্শনে আন্ধ্রদেশান্তর্গত অমরাবতী শিল্পরীতির যে নিঃসন্দেহ ছাপ দেখিতে পাওয়া যায় তাহাতে আশ্চর্য হইবার কোনই কারণ থাকে না। তাহার পরেও এই সকল অঞ্চলের মধ্যযুগের শিল্প-দৃষ্টান্তের মধ্যে বিশেষ করিয়া দক্ষিণ ভারত ও বাংলাদেশের সঙ্গে সঙ্গে উড়িষ্যার প্রভাবও যথেষ্ট বিদ্যমান।

উপরোক্ত জলপথগুলি ব্যতীত ভারতীয় ঔপনিবেশিকগণ পূর্বে ও দক্ষিণ-পূর্বে যাইবার জন্য পূর্ব-বঙ্গ, মণিপুর ও আসামের ভিতর দিয়া স্থলপথ ব্যবহার করিত। বহুদিন পূর্বে, ১৮৮৩ খ্রীস্টাব্দে, সার আর্থার ফেয়ার (Sir Arthur Phayre) এই তথ্যটি নির্ণয় করিয়াছিলেন। সম্প্রতি পেলিও (Pelliot) এবং গেরিনির (Gerini) গবেষণায় এই অনুমান আরও সুদৃঢ় হইয়াছে।

পেলিও দেখাইয়াছেন যে প্রাচীনকাল হইতেই, অন্ততঃ খ্রীঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীতে, পূর্বভারত ও চীনের মধ্যে উত্তর ব্রহ্ম ও ইয়ান-নানের (Yun-nun) ভিতর দিয়া বাণিজ্য-সম্পর্ক ছিল। ই-সিং (It sing) হইতে আমরা জানিতে পারি যে, যে কুড়িজন বৌদ্ধ ভিক্ষুর জন্য শ্রীগুপ্ত একটি মন্দির নির্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন, তাঁহারা এই পথ দিয়াই আসিয়াছিলেন। পরবর্তীকালে আদিম জাতিগণ এই পথ রোধ করিয়াছিল। কিন্তু অষ্টম শতাব্দীতে ইহা পুনরায় সুগম হয়। এই পথ দিয়াই ভারতীয়গণ শুধু উত্তর ব্রহ্মে নয়, ইরাবতী, সালুইন, মেকং

ও লোহিত নদীর পর্বতসঙ্কুল উত্তর উপত্যকাগুলিতে, এমন কি ইয়ান-নান পর্যন্ত তাহাদের উপনিবেশ স্থাপন করে। নবাগত দেশকে মাতৃভূমির অন্তর্গত বিখ্যাত স্থানের নামানুসারে নামকরণ করা ছিল ঔপনিবেশিক-দিগের এক সুপরিচিত রীতি। ব্রহ্মে, শ্যামে ও ইন্দোচীনে ইহার যথেষ্ট দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। ইয়ান-নানের নাম ছিল গান্ধার। ত্রয়োদশ শতাব্দীতেও রসিউদ্দীন এই প্রদেশকে তাহার ভারতীয় নামেই উল্লেখ করিয়াছেন। হিন্দুগণ ইয়ান-নানে (চীনাদের মতে) নান-চাও বা ট-ল রাজ্য স্থাপন করে. রসিউদ্দীন বলেন যে ইয়ান-নানবাসী, হিন্দু ও চীনা হইতে উদ্ভূত। এই দেশে হিন্দু প্রভাবের দৃষ্টান্ত-স্বরূপ আমরা পেলিও'র সাহায্যে জানিতে পারি যে এখানকার নরপতি 'মহারাজ' আখ্যায় ভূষিত হইতেন এবং লোকেরা বোধ হয় হিন্দু অক্ষর হইতে উৎপন্ন এক প্রকার অক্ষর ব্যবহার করিত। ইহা বৌদ্ধ ধর্মের একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল।

নান-চাও ছাড়াও ভারতের পূর্ব সীমান্তে টা-সিন্ (**Ta-tsin**) ও নান্-সি (**Ngan-si**) নামে দুই ব্রাহ্মণ-রাজ্য ছিল। লাওসেও এইরূপ একটি হিন্দুরাজ্য ছিল। পূর্বে লাওস্ মালবদেশ বলিয়া খ্যাত ছিল। টলেমি ইহার পূর্বভাগকে দশন বলিয়াছেন। গেরিনির মতে তাহা দশার্ণের অপভ্রংশমাত্র। গেরিনি ইন্দোচীনের অনেক জায়গার নামের ভারতীয় মূল উদ্ধার এবং সেই সব জায়গার ভারতীয় ঔপনিবেশিকদিগের বিষয় অনেক প্রবাদ সংগ্রহ করিয়াছেন।

ইহা হইতে দেখা যায় যে ইন্দোচীনের মধ্যভাগে এমন অনেকগুলি হিন্দু রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল যেগুলি সমুদ্র হইতে বহুদূরে দুর্গম প্রদেশে অবস্থিত। সুতরাং এই সকল রাজ্যগুলিতে ভারত হইতে যাতায়াতের পথ ছিল স্থলপথে। যে সকল ঔপনিবেশিকগণ সমুদ্রপথে গিয়াছিল, তাহারাই দক্ষিণ ব্রহ্মে, মালয় উপদ্বীপে, সুমাত্রা. জাভা, বোর্ণিও, কম্বোজ ও চম্পার বিখ্যাত রাজ্যগুলি স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

কোনো কোনো পাশ্চাত্য পণ্ডিত পূর্বে মনে করিতেন যে কেবল-

মাত্র মালাবার ও করমণ্ডল উপকূলের ভারতীয়গণের দ্বারাই এই উপনিবেশগুলি স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু এই ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। উত্তর ভারত এবং বিশেষতঃ বঙ্গদেশ যে তাহার সুপ্রসিদ্ধ তাম্রলিপ্তি বন্দরের সাহায্যে, এই ঔপনিবেশিক প্রচেষ্টার ব্যাপারে অন্য কোনও দেশাপেক্ষা কম অগ্রসর হয় নাই তাহা কয়েকটি ঘটনা হইতে বুঝা যাইবে। বৌদ্ধ গ্রন্থে তাম্রলিপ্তি হইতে বণিকদিগের চম্পা ও সুবর্ণভূমির উদ্দেশ্যে সমুদ্রযাত্রার কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। চীনদেশের ঐতিহাসিক পুঁথি হইতে জানিতে পারা যায় যে ২৪০-২৪৫ খ্রীঃ ফু-নানের (কাম্বোডিয়া ও কোচিন চীন) রাজা ভারতবর্ষে একজন দূত পাঠাইয়াছিলেন এবং গঙ্গাসঙ্গমে পৌঁছাইতে তাঁহার এক বৎসর লাগিয়াছিল। খ্রীঃ পঞ্চম শতাব্দীতে গঙ্গারাজ নামে চম্পার এক রাজা সিংহাসন ত্যাগ করিয়া ভাগীরথীর তীরে তাঁহার শেষ জীবন যাপন করিয়াছিলেন। ফা-হিয়েন ও ই-সিংএর বিবরণ হইতেও ইহা দেখা যায় যে পঞ্চম ও সপ্তম শতাব্দীর ভিতরে বঙ্গদেশ ও সুদূর প্রাচ্যের মধ্যে সমুদ্রপথে নিয়মিত যাতায়াত ছিল। খ্রীঃ নবম শতাব্দীতে সুমাত্রার শ্রীবিজয়সাম্রাজ্যের অধিপতি বাংলার দেবপালের সহিত বিশেষ সৌহার্দ্য ছিল। নয়পালের রাজত্বকালে বৌদ্ধ ভিক্ষুকদিগের শিক্ষার্থে সুবর্ণভূমি গমনের কথা তিব্বতীয় ইতিহাসে লিখিত আছে। চম্পায় খ্রীঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীতে গৌড়েন্দ্রলক্ষ্মী নামে এক রাণীর পরিচয় পাওয়া যায়। ইনি সম্ভবতঃ গৌড়দেশীয় এক রাজকন্যা। এই সকল প্রমাণ হইতে সন্ধান পাওয়া যায় যে বঙ্গদেশ ও ভারতীয় ঔপনিবেশগুলির মধ্যে এ পর্যন্ত যে প্রকার সম্পর্ক আমাদের জানা ছিল তাহার চেয়েও গভীরতর সম্পর্ক বর্তমান ছিল। ইহা ছাড়া বিভিন্ন উপনিবেশগুলির অধিকাংশ প্রবাদ হইতেও স্থির করা যায় যে তাহাদের অনেকের মাতৃভূমি উত্তর ভারতের অন্তর্গত ছিল।

নানা প্রমাণ হইতে ইহাও নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে খ্রীষ্টীয় প্রথম দুই শতাব্দীর মধ্যেই ঔপনিবেশিক রাজত্বগুলি স্থাপিত হইয়া-

ছিল। কিন্তু খ্রীঃ দ্বিতীয় শতাব্দী যদিও বৃহত্তর ভারতের রাজত্বগুলি স্থাপনের নিম্নসীমা হইতে পারে, ইহার ঊর্ধ্ব সীমা আরও পূর্বে। আমরা চম্পায় প্রাপ্ত ভোচাংএর সংস্কৃত শিলালিপি হইতে দেখিতে পাইতেছি যে পূর্বতম উপনিবেশ আনাম যখন দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যে ভারতীয়দের অধিকারে আসিয়াছে তখন ভারতীয় ঔপনিবেশিক প্রচেষ্টার ইতিহাস আরও কয়েক শতাব্দী অগ্রসর করিয়া দিতে হইবে। কারণ ইহা স্মরণ রাখা কর্তব্য যে উপনিবেশ স্থাপন কার্য আরম্ভ হয় রাজনৈতিক প্রভুত্ব বিস্তারের বহু পূর্বেই।

যখন ভারতীয়গণ ধীরে ধীরে ব্রহ্মদেশের ও আরও পূর্বদিকের দেশগুলিতে প্রবেশ করিতেছিল তখন সেগুলি অসভ্য জাতি দ্বারা পূর্ণ। ব্রহ্মদেশবাসী ছিল অধুনা আবোর ও মিশমীদের জ্ঞাতি, মঙ্গোলীয়। ইন্দোচীন ও দ্বীপপুঞ্জের লোকেরা ছিল মালয়-পলিনেশীয় বা অষ্ট্রেলেশীয়। এই অঞ্চলের অধিবাসীরা বহির্জগতের সকল সম্বন্ধ পরিহার করিয়া নিরন্তর যুদ্ধবিগ্রহে কাটাইত বা বন্যজীবন যাপন করিত। তাহাদের নিকট-প্রতিবেশী চীনারাও যাহা করিতে সমর্থ হয় নাই, এই বিভিন্ন প্রকৃতির মানবগোষ্ঠীকে সভ্যতার আলোকে আনয়ন করাই হইল ভারতীয় ঔপনিবেশিকদের সেই একমাত্র সাধনা। বাস্তবিক ভারতীয়গণ বৃহত্তর ভারত জয় করিয়াছিলেন, রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টা অপেক্ষা কৃষ্টি বা সভ্যতার দ্বারা। দেশীয় জাতিরা অল্প সময়ের মধ্যেই বিজেতা বা ঔপনিবেশিকের সংস্পর্শে আসিয়া তাহার ধর্ম, শিল্প, সামাজিক প্রথা, লিখন-প্রণালী, ন্যায়বিচার, শাসন-প্রণালী সবই সাগ্রহে ও সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিল। নব ভারতের সৃষ্টি হইল শুধু ভারতের শারীরিক শক্তি ও উদ্যমে নয়—ভারতের অপূর্ব সভ্যতা ও সাধনায়। এই দূরদেশে গড়িয়া উঠিল মাতৃ-ভূমির বিখ্যাত জনপদগুলির নামানুসারে নব নব অযোধ্যা, কৌশাম্বী, শ্রীক্ষেত্র, দ্বারাবতী, মথুরা, চম্পা, কলিঙ্গ, কম্বোজ, গান্ধার ও অমরাবতী।

দ্বীপময় ভারত

অতি পুরাকাল হইতেই ভারতীয় সাহিত্যে যবদ্বীপের নাম পাওয়া যায়। রামায়ণে যবদ্বীপের উল্লেখ আছে এবং সুমাত্রাকে বোধহয় সুবর্ণ-দ্বীপ বলা হইয়াছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে দ্বীপপুঞ্জের সবচেয়ে পুরাতন শিলালিপি, অনুমান খ্রীঃ চতুর্থ শতাব্দীতে লেখা, যবদ্বীপে পাওয়া যায় নাই—পাওয়া গিয়াছে পূর্ব বোর্ণিওতে। ইহার বর্ণমালার সহিত দক্ষিণ ভারতের পল্লব-শিলালিপি এবং চম্পা ও কম্বোজের শিলা-লেখের সাদৃশ্য আছে। ইহা সংস্কৃত ভাষায় লিখিত এবং ইহাতে অশ্ব-বর্মণ নামে এক রাজার নাম পাওয়া যায়। দ্বীপপুঞ্জ ও ইন্দোচীনের প্রায় সকল রাজাই বর্মণ-পদবীযুক্ত (কাঞ্চীর পল্লবরাজ্যের ন্যায়) ভারতীয় নাম ধারণ করিতেন। পশ্চিম যবদ্বীপে প্রাপ্ত পঞ্চম শতাব্দীর শিলালিপিতে রাজা পূর্ণবর্মণের সন্ধান পাওয়া যায়। প্রাচীন বোর্ণিও, চম্পা ও কম্বোজের ন্যায় ইহাও পল্লব-গ্রন্থ অক্ষরে লিখিত। ফা-হিয়েন ভারত হইতে ক্যান্টনে ফিরিবার কালে পথিমধ্যে পশ্চিম যবদ্বীপে আসিয়াছিলেন। তাঁহার অর্ণবপোতে দুই শত হিন্দু বণিক ছিল। কাশ্মীরের সন্ন্যাসী রাজকুমার গুণবর্মণই বোধ হয় ৪২৩ খ্রীষ্টাব্দে যবদ্বীপে প্রথম বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন। এখান হইতে তিনি 'নন্দী' নামে এক হিন্দুর পোতে করিয়া চীনদেশে গমন করেন।

ডঃ বিজনরাজ চট্টোপাধ্যায়ের মতে ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে পশ্চিম যবদ্বীপের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে মধ্য যবদ্বীপ প্রাধান্য লাভ করে। আমরা পূর্ব যবদ্বীপে দিনয়ে প্রাপ্ত একটি শৈব শিলালিপি (৬৮২ শঃ = ৭৫০ খৃঃ) হইতে অগস্ত্য ঋষির একটিমূর্তি নির্মাণ ব্যাপার জানিতে পারি। অগস্ত্য ঋষির বংশধরগণ যবদ্বীপে আসিয়া বসবাস করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। সপ্তম শতাব্দীতে ডিয়েং মালভূমিতে নির্মিত চণ্ডী ভীম, চণ্ডী অর্জুন প্রভৃতি পাষাণ মন্দিরগুলিই যবদ্বীপে সবচেয়ে পুরাতন মন্দির। ইহাদের স্থাপত্যের সহিত কাঞ্চীরাজ মহেন্দ্রবর্মণ কর্তৃক সমসাময়িককালে নির্মিত মামল্লপুরের কয়েকটি রথের যথেষ্ট

সাদৃশ্য আছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। রাজা সঞ্জয়ের জাঙ্গল শিলালেখতেও লিখিত আছে যে যবদ্বীপের প্রথম শৈব মন্দির অগস্ত্য গোত্রীয় এক ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায় কর্তৃক নির্মিত হইয়াছিল দাক্ষিণাত্যের তীর্থ তুঙ্গভদ্রাতীরে কুঞ্জরকুঞ্জ (কোণ) দেশের শৈব-মন্দিরেব অনুকরণে।

অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে, মধ্য যবদ্বীপ শৈব অধিপতিদের হস্ত-চ্যুত হইয়া সুমাত্রার সুবিখ্যাত মহাযান বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী শৈলেন্দ্র-বংশের করতলগত হয়। চৈনিক বিবরণে পালেমবাংএ খ্রীঃ পঞ্চম শতাব্দীতে এক হিন্দু ভাবাপন্ন রাজত্বের উল্লেখ আছে। ডঃ সেদেস্ পালেমবাংকে চৈনিক সন্-ফোট-সি (San-fot-si) অথবা শ্রীবিজয়ের সহিত সনাক্ত করিয়াছেন। এই বিরাট শ্রীবিজয় সাম্রাজ্য শুধু সুমাত্রা যবদ্বীপে নহে, মালয় উপদ্বীপ এবং কাম্বোডিয়াতেও বিস্তৃত ছিল। কিন্তু ইহা কম আশ্চর্যের বিষয় নয় যে শৈলেন্দ্র-শিল্পের মুকুটমণি চণ্ডী বোরো-বুদুর সুমাত্রায় না হইয়া মধ্য যবদ্বীপে অবস্থিত। চণ্ডী বোরোবুদুর যে শুধু ভারতীয় আদর্শে গঠিত তাহা নয়, সম্প্রতি বঙ্গদেশে পাহাড়পুর ও মহাস্থানে যে মন্দির আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাদের সহিত এবং বিশেষতঃ চণ্ডী সেউর (Chandi Sewu) নানা বিষয়ে সাদৃশ্য আছে। গত কয়েক বৎসরের মধ্যে বোরোবুদুরের নিম্নতম স্তর মৃত্তিকাগর্ভ হইতে খনন করিয়া বাহির করা হইয়াছে। অন্যান্য স্তরের ন্যায় ইহাও বৌদ্ধ জাতক-মালায় চিত্রিত। স্থাপত্যের ন্যায় এই যুগের অপূর্ব ভাস্কর্য কিরূপ ভারতীয় ভাবে, আদর্শে ও কলাকৌশলে অনুপ্রাণিত তাহা চণ্ডীমেণ্ডুতের অবলোকিতেশ্বরের স্বর্গীয় শান্তিতে উদ্ভাসিত স্বভাবসম্মত সৌম্য মূর্তি দেখিলে প্রত্যয় হইবে। খ্রীঃ দশম শতাব্দীতে চোলরাজের সম্মতি লইয়া এক শৈলেন্দ্র-নৃপতির ব্যয়ে মান্দ্রাজের নিকট নেগাপটমে একটি বৌদ্ধ মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। পুনরায় মহারাজ দেবপালের নালন্দা তাম্রশাসন হইতে জানা যায় যে তিনি যবভূমির অধিপতি শৈলেন্দ্র-কুলতিলক মহারাজ বালপুত্রদেবের বৌদ্ধধর্মানুরাগ-নিদর্শন স্বরূপ

নালন্দায় নির্মিত বিহারের ব্যয়নির্বাহার্থ কতকগুলি গ্রাম দান করিয়াছিলেন। চৈনিক পরিব্রাজক ই-সিং ৭ম শতাব্দীতে সুমাত্রায় আসিয়াছিলেন তখনও পর্যন্ত সুমাত্রা হীনযান-ধর্মের কেন্দ্র ছিল।

চণ্ডীকলসনে একটি অসাধারণ শিলালিপি (৭৭৩ খ্রীঃ) পাওয়া গিয়াছে। ইহা এ পর্যন্ত প্রাপ্ত শিলালিপির ন্যায় দাক্ষিণাত্যের পল্লব অক্ষরে লিখিত না হইয়া উত্তর ভারতীয় বর্ণমালায় ক্ষোদিত। এই উত্তর ভারতীয় বর্ণমালার আবার দেবনাগরী অপেক্ষা বাংলা অক্ষরের সহিত বেশী সাদৃশ্য আছে। এই বিশেষত্বটি এবং মহাযান বৌদ্ধধর্ম, তান্ত্রিক আচার ও শৈবমতবাদের অদ্ভুত সংমিশ্রণ এই সময় হইতে আরম্ভ হইয়া পরেও যবদ্বীপে, সুমাত্রায় ও কম্বোজে পরিলক্ষিত হয়। ডঃ বিজনরাজ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এইজন্য মনে করেন যে অষ্টম শতাব্দী হইতে ধর্মে, ভাষায় ও শিল্পবিষয়ে বৃহত্তর ভারতে ধীরে ধীরে দাক্ষিণাত্যের প্রভাব নিষ্প্রভ হইয়া পড়ে এবং বঙ্গ-মগধের প্রভাব প্রবল হইতে থাকে। অধ্যাপক কার্ণ বলেন যে নালন্দার বিখ্যাত গুরু মহাস্থবির ধর্মপাল তাঁহার শেষজীবন সুমাত্রায় অতিবাহিত করেন। সুমাত্রা যে বৌদ্ধধর্মের কত বড় কেন্দ্র ছিল ইহা হইতে তাহা বুঝা যায়।

সুমাত্রায় এতদিন পর্যন্ত প্রত্নতত্ত্বের বিশেষ কিছু নিদর্শন পাওয়া যায় নাই। কিন্তু মাত্র কয়েক বৎসর পূর্বে এখানে অনেকগুলি মূল্যবান মূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহার মধ্যে বুদ্ধের সুবৃহৎ পাষাণমূর্তিটি সর্বাপেক্ষা পুরাতন—তৃতীয় বা চতুর্থ শতাব্দীর হইবে। সেইজন্য ইহাতে অমরাবতীর শিল্পভঙ্গীর প্রভাব সুস্পষ্ট। পরবর্তীকালের একটি চমৎকার দণ্ডায়মান বুদ্ধমূর্তি গঠনে কিন্তু পল্লব-শিল্পের ছায়া নিঃসন্দেহে বর্তমান। আবার অন্য একটি উপবিষ্ট ব্রোঞ্জ অবলোকিতেশ্বর মূর্তিতে, যবদ্বীপের প্রায় সকল ব্রোঞ্জমূর্তির ন্যায়, গৌড়-মগধের প্রভাব আশ্চর্য রূপে প্রতিফলিত।

যবদ্বীপে সুমাত্রার আধিপত্য বোধ হয় দশম শতাব্দী পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। এই সময়ে মধ্য যবদ্বীপের শৈবরাজগণ তাঁহাদের হৃতগৌরব

উদ্ধার করিতে সমর্থ হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণ্যধর্ম যে পুনর্জীবন লাভ করিল তাহা প্রাম্বানানের মন্দিরগাত্রস্থ অলৌকিক রামায়ণ-চিত্রাবলী হইতে উপলব্ধি করা যায়। একাদশ শতাব্দীতে চোলরাজ রাজেন্দ্র চোলের নৌ-বাহিনী দিগ্বিজয়ে বাহির হইয়া মালয় ও সুমাত্রার কতকাংশ অধিকার করে। ইহার পরে রাজনৈতিক শক্তির কেন্দ্র পূর্ব যবদ্বীপে স্থানান্তরিত হয় এবং ক্রমে কিরূপে বিশুদ্ধ ভারতীয় ভাব ও সভ্যতা প্রাদেশিক পলিনেশীয় প্রভাব দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে তাহা পানাতরণ মন্দির-ভাস্কর্য আলোচনা করিলে হৃদয়ঙ্গম হয়। অবশেষে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে মুসলমান কর্তৃক 'মজপহিত' রাজ্যবিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে যবদ্বীপ হইতে হিন্দু সভ্যতা ও সাধনা লুপ্ত হইল।

যবদ্বীপীয় প্রবাদ অনুসারে ১৪৭৮ খ্রীষ্টাব্দে মজপহিত রাজ্যের অবসানের কিছু পূর্বেই (বোধ হয় ভারতবর্ষ হইতেই) কতকগুলি শৈব ব্রাহ্মণ মজপহিতে আসিয়া পরে বলিদ্বীপে পলায়ন করেন। বলিদ্বীপে ব্রাহ্মণগণ পাদণ্ড (পণ্ডিত) বহুরবু হইতে আপনাদের উৎপন্ন মনে করেন। বর্তমান পঞ্চব্রাহ্মণ সম্প্রদায়, তিনি ও তাঁহার পঞ্চপত্নী হইতে উদ্ভূত। বৌদ্ধধর্ম অপেক্ষা ব্রাহ্মণ্যধর্মেরই বলিদ্বীপে এখনও প্রাধান্য বেশী। কিন্তু কোনও মহাভোজের সময় চারজন শৈব পণ্ডিতের সহিত একজন বৌদ্ধ পুরোহিতও আমন্ত্রিত হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণকে ইদ, ক্ষত্রিয়কে দেব, বৈশ্যকে গুষ্টি, ও শূদ্রকে বাপে ও মেয়ে বলা হইয়া থাকে। বেদের কতকাংশ মাত্র বলিদ্বীপে বর্তমান। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ বোধ হয় সম্পূর্ণ পাওয়া যায়। তুভুর নামক পুস্তকে নানাপ্রকার হিন্দু-শাস্ত্র সংগৃহীত আছে। বলিদ্বীপে কবি-ভাষায় লিখিত রামায়ণ পাওয়া যায়। উত্তরকাণ্ড একটি পৃথক গ্রন্থ বলিয়া পরিগণিত। মহাভারতের নাম বলিদ্বীপে অজ্ঞাত। তবে কবিভাষায় ইহার ছয়টি পর্ব লইয়া একটি পৃথক গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। বলিদ্বীপের আধুনিক স্থাপত্য ও ভাস্কর্য মজপহিত যুগের ভঙ্গীতেই বিরচিত। ৯২২ খ্রীষ্টাব্দের এক শিলালিপিতে বলিদ্বীপের প্রথম রাজার পরিচয় পাওয়া যায়, তাঁহার নাম উগ্রসেন।

এই শিলালিপিগুলির পুরাতন বলিভাষা যবদ্বীপের কবিভাষা হইতে স্বতন্ত্র। প্রথমে বলিদ্বীপ যবদ্বীপের প্রভাব হইতে আপনাকে বাঁচাইয়া চলিয়াছিল, মজপহিত রাজ্যের যুগে প্রথম ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ হয়।[১৬]

১৯২০ সালের ডাচ্ প্রত্নতাত্ত্বিক কার্যবিবরণীতে ডঃ বশ্ পূর্ব বোর্ণিওর কোটাইরাজ্যে হিন্দু সভ্যতার নিদর্শন স্বরূপ এক পর্বতগুহার মধ্যে প্রাপ্ত শৈব ও বৌদ্ধ মূর্তিসকল পাওয়া গিয়াছে তাহার পরিচয় দিয়াছেন। বশ্-এর মতে ঐ মূর্তিগুলির শৈলী হিন্দু-জাভানীয়। সুতরাং তিনি মনে করেন যে প্রাচীনকালে সোজাসুজি ভারতবর্ষ হইতে না আসিয়া ঔপনিবেশিকগণ যবদ্বীপ হইতে বোর্ণিওতে আসিয়া বসবাস করিয়াছিল। যাহাই হউক আবিষ্কৃত মূর্তিগুলির মধ্যে যে মনোহারা দণ্ডায়মান বুদ্ধমূর্তি পাওয়া গিয়াছে তাহা কিন্তু সম্পূর্ণরূপে ভারতের গুপ্তযুগের শিল্পদ্বারা অনুপ্রাণিত। ভারতের সহিত প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ না থাকিলে ইহা সম্ভবপর হইত না।

পুরাকালের ভারতীয় সভ্যতার সীমাজ্ঞান ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। মাত্র দুই বৎসর পূর্বে সেলিবিস দ্বীপে একটি অসামান্য বুদ্ধমূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা বৃহত্তর ভারতে এ পর্যন্ত প্রাপ্ত সকল ব্রোঞ্জমূর্তি হইতে বৃহৎ। যবদ্বীপ ও সুমাত্রার মূর্তিসকল অপেক্ষা ইহার বয়স আরও বেশী। অমরাবতী শিল্পের ছাপ ইহাতে এতদূর পরিস্ফুট যে ডঃ বশ্ অনুমান করেন ইহা সত্যসত্যই অমরাবতী হইতে আনীত হইয়াছিল।

সম্প্রতি ডঃ পঞ্চানন মিত্র পলিনেশীয়ার দ্বীপসমূহে যাইয়া মাওরী প্রথা, লোকসাহিত্য ও বিশেষতঃ শিল্পে ভারতীয় সভ্যতা ও শিল্পের অনেক চিহ্ন আবিষ্কৃত করিয়াছেন।[১৭] গত বৎসর ফিলিপাইন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধ্যাপক ধীরেন্দ্রনাথ রায় ফিলিপাইন দ্বীপে ভারতীয় ধর্ম, ভাষা ও শিল্পের প্রভাবের আশ্চর্য বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন। সেখানকার অনেক দেশীয় লিখন প্রণালীর সহিত দাক্ষিণাত্যের তামিল, তেলেগু প্রভৃতির সহিত বহু সাদৃশ্য আছে। দেশীয় ভাষা সংস্কৃত শব্দবহুল। আবিষ্কৃত ধাতুমূর্তির মধ্যে শিব ও গণেশ উল্লেখ-

যোগ্য। অধুনা আমেরিকান পণ্ডিতগণ পলিনেশিয়া ও ফিলিপাইনে হিন্দু সভ্যতা সম্বন্ধে বহুমূল্য গবেষণা করিতেছেন।

ইন্দোচীন

ইন্দোচীন যে ভারত ও চীনের মিলনক্ষেত্র তাহা তাহার নামই নির্দেশ করে। আদিম মালয় পলিনেশিয় উপাদানের উপর ভারতের প্রভাব প্রথম বিস্তৃত হয় এবং অনেক পরে চীনদেশের সংস্পর্শে রূপান্তরিত হইয়া যায় এদেশের মিশ্র সভ্যতা।

বর্তমান আনামের পুরাতন নাম ছিল চম্পা। চম্পায় ভারতীয় উপনিবেশ যে খ্রীস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে স্থাপিত হইয়াছিল ইহা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেন। এই সময়ের লেখা ভো-চাংএর (Vo-Chanh) সংস্কৃত শিলালিপি বহির্ভারতে প্রাপ্ত সর্বপ্রাচীন লেখা। ইহা হইতে বুঝা যায় যে চম্পায় ঔপনিবেশিক প্রচেষ্টা আরম্ভ হইয়াছিল দ্বিতীয় শতাব্দীর পূর্বেই। চম্পারাজ্য সমৃদ্ধিলাভ করিলে উহার সীমানা চীন সাম্রাজ্যের প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তারিত হইয়াছিল। উভয় রাজ্যের মধ্যে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ছিল। চীনা পুঁথি হইতে চম্পার অনেক ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া গিয়াছে। চম্পা চারিটি প্রদেশ বা 'বিষয়ে' বিভক্ত ছিল যথা অমরাবতী (বর্তমান Quang-nam), পাণ্ডুরঙ্গ (বর্তমান Phan-rang), বিজয় (বর্তমান Bin-dinh) ও কৌঠার (বর্তমান Nha-trang)। অমরাবতী ও বিজয়ের বন্দর ছিল যথাক্রমে সিংহপুর ও শ্রীবিনয়। সংস্কৃত সাহিত্য এবং রামায়ণ ও মহাভারত চম্পাবাসীর সুপরিচিত ছিল। সপ্তম শতাব্দীতে একবার এক চীনসেনাপতি লিউ-ফাং চম্পারাজ শম্ভুবর্মণকে পরাজিত করিয়া চীনে ফিরিয়া যাইবার সময় ১৩৫০টি বৌদ্ধ পুস্তক লুণ্ঠন করিয়া লইয়া যান। চম্পায় বৌদ্ধশাস্ত্রের কিরূপ আলোচনা হইত এই ঘটনাটি তাহা প্রমাণ করে। প্রতিবেশী আদিম অনার্যদের সহিত চম্পাবাসী নিরন্তর যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকিত। এই অনার্যরাই অবশেষে হইল চম্পার পতন ও সর্বনাশের মূল।

খ্রীঃ চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমভাগে উত্তর হইতে আদিমজাতির চম্পা প্লাবিত করিয়া হিন্দুরাজত্বের অবসান করিয়া দিল।

চম্পার অমরাবতীপ্রদেশের রাজধানী ইন্দ্রপুরের ধ্বংসাবশেষ ডং-ড়য়ং (**Dong Duong**) নামক স্থানে অবস্থিত। সেখানে যে ব্রোঞ্জ-নির্মিত অতি-সুন্দর বুদ্ধমূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার রূপভঙ্গী যে মাতৃভূমি অমরাবতী ভাস্কর্যের অনুরূপ হইবে সে আর আশ্চর্য কি! কোনও কোনও পণ্ডিতের মতে ইহা সিংহল বা অমরাবতী হইতে নির্মিত হইয়াই আসিয়াছিল। চম্পার প্রাচীন কীর্তির মধ্যে কিন্তু হিন্দু-শৈব মন্দিরই বেশী। খ্রীস্টীয় সপ্তম-অষ্টম শতাব্দীতে নির্মিত 'শ্রীলিঙ্গরাজ' মন্দির ও কৌঠা'র পো-নগরের ভগবতী মন্দির সর্বাপেক্ষা খ্যাত। ভগবতীর যে মনোরম মূর্তিটি সম্প্রতি পাওয়া গিয়াছে তাহা দর্শনমাত্রেই গৌড়শিল্পের প্রভাবে প্রভাবিত বলিয়া মনে হয়।

হিন্দু ঔপনিবেশিকের প্রথম প্রবাহ কম্বোজে (কাম্বোডিয়া) পৌঁছাইয়াছিল খ্রীস্টীয় প্রথম শতাব্দীতে। দ্বিতীয় প্রবাহ আসিয়াছিল আরও তিনশত বৎসর পরে। চৈনিক ইতিহাস হইতে জানিতে পারা যায় কাম্বোডিয়া, কোচিন চীন ও দক্ষিণ শ্যাম লইয়া 'ফু-নান' নামে একটি বৃহৎ রাজ্যের কথা। ভারতীয় ব্রাহ্মণ কৌণ্ডিণ্য অর্ণবপোতে খ্রীঃ প্রথম শতাব্দীতে ফু-নানে আসিয়া সোমা নামে রাজকন্যাকে বিবাহ করিয়া দেশের অধীশ্বর হইলেন। দ্বিতীয় হিন্দু ঔপনিবেশিকদল কম্বোজ বা কম্বুজরাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথমে কম্বোজ ফু-নানের আধিপত্য স্বীকার করিয়াছিল। ৫৪৮ খ্রীঃ উজ্জয়িনীর বিখ্যাত পরমার্থ চীনদেশে নানকিংএ যাইবার পথে ফু-নানে কিছুদিনের জন্য তাঁহার বাণী প্রচার করিয়া যান। কম্বোজের শক্তিবৃদ্ধি করেন রাজা চিত্রসেন মহেন্দ্রবর্মণ খ্রীস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে ফু-নান জয় করিয়া। মহেন্দ্রবর্মণের শাসনকালে যে সংস্কৃত শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে তাহাই কম্বোজের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন লেখা। এই সময় হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত কম্বোজে আধিপত্য করিলেন ভারতীয় রাজবংশ। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে

উত্তরদিক হইতে থাইজাতির আক্রমণে হিন্দুবংশ ধ্বংস হইয়া গেল। এই দীর্ঘ সাত শতাব্দী কম্বোজের গৌরবময় যুগ। এই সময়েই কম্বোজের বিশ্ববিখ্যাত মন্দির ও প্রাসাদগুলি তৈয়ারী হয়। ভারতীয় রীতি স্থানীয় ভাস্কর্য ও স্থাপত্যকলা সমৃদ্ধি করিল বটে কিন্তু যবদ্বীপের ন্যায় এখানেও কারু-মণ্ডণশিল্পে দেশীয় স্বাতন্ত্র্য অনেক পরিমাণে রক্ষিত হইল। ভারতীয় বর্ণমালা ব্যবহৃত হইতে লাগিল দেশীয় ক্মের (Khmer) ভাষায়। সংস্কৃত ভাষা ও সাধনার চর্চা কতদূর অগ্রসর হইয়াছিল তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ প্রাচীন লেখমালা। এই সময় যদিও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম কম্বোজে প্রাধান্যলাভ করিয়াছিল তথাপি বৌদ্ধধর্মও পাশাপাশি বিরাজিত ছিল শান্তিতে ও সগৌরবে।

প্রাচীন কম্বোজের রাজধানী বহুবার স্থানান্তরিত হইয়াছিল। সেই সকল রাজপুরীর ধ্বংসাবশেষ কম্বোজের নানাস্থলে বিক্ষিপ্ত। বেশীর ভাগ মন্দির ও প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ উত্তর কম্বোজের বিশাল হ্রদের (Tonle-Sap) নিকট অবস্থিত। মহারাজ যশোবর্মণ (৭৮৯ খ্রীঃ) স্থাপিত রাজধানী যশোধরপুরের বর্তমান আঙ্কোর থোম (Angkor-Thom) এখন ভীষণ অরণ্যানীবেষ্টিত। এই দুর্গম অরণ্যের কবল হইতে লুপ্তগৌরব উদ্ধার করিতে মানুষের কতই না আগ্রহ, কতই না পরিশ্রম. কম্বোজে হিন্দুকীর্তির মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ যশোধরপুরের শৈব মন্দির, বাপুয়নের বৈষ্ণব দেউল, বায়নের (Bayon) ব্রহ্মার চতুর্মুখ শোভিত সুবিশাল মন্দির-তোরণ এবং সর্বোপরি কম্বোজ স্থাপত্যনৈপুণ্যের চরম পরিণতি 'পরমবিষ্ণু লোক' মহারাজ সূর্যবর্মণের পৃষ্ঠপোষকতায় দ্বাদশ শতাব্দীতে নির্মিত, মহাভারত পুরাণাদির পাষাণচিত্র পরিশোভিত 'আঙ্কোর ওয়াটে'র (Angkor-Wat) বিরাট বিষ্ণুমন্দির।

পণ্ডিত কাবার্তা বলেন, 'এইসব মন্দির দেখিয়া মনে হয় কম্বোজে এমন একটা ভাব ও সাধনার বিকাশ হইয়াছিল যাহা জ্ঞান ও চিন্তা-বিমুখ ক্মের জাতির নিজস্ব সম্পদ বলিয়া অনুমান করা কঠিন; তাহা শুধু হিন্দু শিল্প-নৈপুণ্য ও প্রতিভার দ্বারাই সম্ভব।' সেদিন ডঃ

প্রবোধচন্দ্র বাগচী আশার বাণী জানাইয়া লিখিয়াছেন, 'কিছুদিন থেকে সাইগনের ভারতীয় বণিকদের মধ্যে একটু ধর্মভাব জেগেছে এবং তাঁরা কিছু অর্থব্যয় করে আঙ্কোর ভাটে নিয়মিত ভাবে প্রদীপ জ্বালবার ব্যবস্থা করেছেন। যে প্রদীপ সাতশো বছর ধ'রে নির্বাপিত ছিল তা' আবার জ্বলেছে। তাই আশা হয় ভারতসন্তানদের চেষ্টায় আবার আঙ্কোরের ভাঙ্গা মন্দিরে নূতন ক'রে দেবতার প্রাণপ্রতিষ্ঠা হবে। মন্দির-চত্বর হয়ত আবার ভারত-সন্তানের কলধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠ্‌বে।'[১৯] আমরা সেই শুভদিনের কামনা করি সর্বতোভাবে সর্বান্তঃকরণে।

গ্রন্থপঞ্জী

১. K. Nag—Greater India, Calcutta, 1927. (J.G. I. S.)*

২. O. C. Gangoly—Art of Java, Calcutta

৩. R. C. Mazumder—Champa, Lahore, 1927, (J. G. I. S.)

৪. P. C. Bagchi—(1) Sino—Indica, 2 Vols, Calcutta University, 1927-29

(2) India and China, Calcutta, 1927, (J. G. I. S.)

৫. B. R. Chatterji—(1) Indian Cultural Influence in Cambodia, Calcutta University, 1928

(2) India and Java (J. G. I. S.), Calcutta, 1933

৬. সু. কু. চট্টোপাধ্যায়—দ্বীপময় ভারত, প্রবাসী ১৩৩৭, ধারাবাহিক প্রবন্ধ।

৭. U. N. Ghosal—Ancient Indian Culture in Afghanistan (J. G. I. S.), Calcutta, 1928

৮. N. P. Chakravarti—India & Central Asia, (J. G. I. S.), Calcutta, 1933

৯. N. Roy—Brahmanical Gods in Burma, Calcutta University, 1932

১০. H. B. Sarkar—Indian Influence on the Literature of Java—Bali, (J G. I. S), Calcutta, 1935

১১. D. P. Ghosh—(1) Buddha Images of Orissa & Java, Modern Review, Nov, 1933

(2) Early Art of Srivijaya, (J G. I. S.) Jan. 1934

(3) Migration of Indian Decorative Motifs, (J. G. I. S.) Jan. 1935

১২. P. K. Mukherii—Indian Literature in China and Far East, (J. G. I. S.), Calcutta

১৩. P. N. Bose—Indian Colony of Siam (J G. I. S.), Lahore

১৪. বৃহত্তর ভারতের শিল্প ও সভ্যতা সম্বন্ধে যাঁহারা বিস্তারিত বিবরণ জানিতে ইচ্ছুক তাঁহাদের পক্ষে আনন্দ কুমারস্বামী লিখিত History of Indian and Indonasian Art, London, 1927 এবং 'ইণ্ডিয়া সোসাইটী' প্রকাশিত Influences of Indian Art, London, 1925, এই অমূল্য গ্রন্থদ্বয় বিশেষ উপযোগী।

১৫. ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের 'চম্পা' নামক ইংরেজী পুস্তকের ভূমিকা অবলম্বনে এই অধ্যায়টি প্রধানতঃ লিখিত।

১৬. বিজনরাজ চট্টোপাধ্যায়—India & Java, ১২-১৩ পৃষ্ঠা

১৭. Indian and Polynesian Art : Journal of the Indian Society of Oriental Art, December 1933

১৮. Hinduism in the Philipines, 'Prabuddha Bharat', June, 1935

১৯. ভারত ও ইন্দোচীন ৫৮-৫৯ পৃঃ।

J. G. I S.—Journal of the Greater India Society

ইন্দোনেশিয়া পরিক্রমা

বিষুবরেখা বরাবর তিনহাজার মাইল ধরে ছড়ানো পৃথিবীর বৃহত্তম দ্বীপপুঞ্জ—ইন্দোনেশিয়া। ১৯৬১ সালের গোড়ার দিকে আমি বলি, জাকার্তা, বান্দুংএর পজ্‌জরণ, মালাং ও দেন পাসারের ঐর্লঙ্গ এবং যোগ্যকার্তার গজমদ্—এই পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দেবার জন্য ইন্দোনেশীয় সরকারের আমন্ত্রণে রওনা হই।

এশিয়া ও অষ্ট্রেলিয়া—দুই মহাদেশের মধ্যে ছড়ানো ইন্দোনেশিয়ার দ্বীপগুলি—যবদ্বীপ, সুমাত্রা, বোর্নিও (কালিমান্তান), সেলিবিস (শেলোয়াসি) নৌশতেগরা, মালাক্কা (মালাকু)। এর সহস্রাধিক দ্বীপ প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যে পূর্ণ। দৃশ্যাবলীর মধ্যে আগ্নেয়গিরি, পর্বতশ্রেণী, মালভূমি, গহন অরণ্য, জলপ্রপাত, স্বচ্ছ হ্রদ প্রভৃতি অগণিত। প্রবাল দ্বীপে নারিকেল গাছের সারি সমুদ্রের বেলাভূমি পর্যন্ত নেমে এসে যেখানে থেমেছে সেখান থেকে আরম্ভ হয়েছে ভেঙ্গে পড়া ঢেউয়ের সাদা ফেনা, গিরিকন্দরে গভীর অরণ্যের মধ্যে জন্ম নিয়ে নদীগুলি এঁকেবেঁকে বয়ে চলেছে ভারত মহাসাগরের মরকতমণির মত গাঢ় সবুজ জলে মিলতে। এই সৌন্দর্য হল ইন্দোনেশিয়ার প্রাকৃতিক রূপ।

সুমাত্রার উত্তর প্রান্ত থেকে যবদ্বীপ, বলি, সেলিবিস ও মালাক্কা হয়ে ফিলিপাইনস্ পর্যন্ত একটা দীর্ঘ মালা চলে গিয়েছে আগ্নেয়গিরির —ইন্দোনেশিয়ার নৈসর্গিক পটভূমিতে, প্রাধান্য এদেরই। এইরকম তিন শতাধিক শিখরের মধ্যে প্রায় ষাটটি আজও সক্রিয়। এককালে এই আগ্নেয়গিরিগুলি চারিপাশের বহু গ্রাম ও জনপদ ধ্বংস করেছে, মহান কীর্তিচিহ্ন অবলুপ্ত করেছে; যেগুলি সক্রিয় সেগুলি আজও করছে—যেমন বোরোবুদুর ও প্রাম্বানামের কাছে মধ্য-যবদ্বীপের মেরাপি ও পূর্ব যবদ্বীপের ক্লেদুৎ। দেশাভ্যন্তরে ভ্রমণকালে একাধিকবার দেখেছি মসীকৃষ্ণ 'লাভা' রাস্তা পর্যন্ত গড়িয়ে এসেছে বা পুল-সাঁকো ভেঙ্গে দিয়ে

গেছে। অবশ্য পাহাড়ের পাদদেশের অত্যুর্বর ভূমিও এই লাভারই কৃপায়। দিয়েন মালভূমিতে ৬৫০০ ফুট উঁচু একটি ছোট আগ্নেয়গিরির গহ্বরে নেমেছিলাম। আজকাল কোন আগ্নেয়গিরি অস্থির বা সক্রিয় হবার সম্ভাবনা হলেই আগ্নেয়গিরি-বিভাগীয় লোকেরা আগে থেকে সকলকে সাবধান করে দেন।

ইন্দোনেশিয়া বিষুবরেখার উপর বলে উষ্ণপ্রধান। বৎসরের ভাগ দুটি ঋতুতে—কার্তিক থেকে বৈশাখ আর্দ্র ঋতু এবং বাকী সময়টা শুষ্কঋতু। বারিপাত যথেষ্ট। আমি গিয়েছিলাম বর্ষার সময়েই। লক্ষ্য করেছি—প্রায় প্রতিদিন দুপুর দুটা নাগাদ বৃষ্টি নামত; সারারাত ধরে কয়েক পশলা বৃষ্টি হয়ে ভোরবেলা মেঘ কেটে যেত। সেইজন্যই বোধহয় ইন্দোনেশিয়ার আফিস দোকান সর্বত্র কাজ চলে সকাল ৮টা থেকে ২টা পর্যন্ত।

ইন্দোনেশিয়ার জনসংখ্যা ৮ কোটি—মালয় পলিনেশীয় গোষ্ঠী। যবদ্বীপে সবচেয়ে ঘনবসতি—বর্গমাইল পিছু হাজার জন। অধিবাসীরা হাসিখুসি, স্ফূর্তিপ্রিয়, কিছুটা অলস ও ভাবপ্রবণ হলেও যত্ন, সাহায্য ও অতিথিপরায়ণতায় কখন বিমুখ নয়—বিদেশী হলে ত' কথাই নেই। সহরবাসীদের সাজ ধবধবে সাদা। প্রত্যেকে নিজের বাড়ীতে কাপড় কেচে নেয়। হোটেল ছাড়া ধোবা পাওয়া যায় না এবং কোথাও লণ্ড্রী দোকানও নেই। এরা ইস্‌লাম বিশ্বাসী হলেও সুমাত্রা বাদে কোথাও গোঁড়ামী বিশেষ নেই। যবদ্বীপের লোকেরা ধর্ম বিষয়ে নিতান্ত সহনশীল ও অতি উদারভাবাপন্ন। বর্তমান ইন্দোনেশিয়ার ভাষা গড়ে উঠেছে বিভিন্ন দ্বীপে ব্যবহৃত মালয়ী ভাষা থেকে। স্বাধীনতালাভের পর সমগ্র ইন্দোনেশিয়াতে ইংরাজীকে দ্বিতীয় ভাষার স্থান দেওয়া হয়েছে। যবদ্বীপের প্রাচীনভাষা সংস্কৃত শব্দবহুল—অক্ষরগুলি প্রাচীন দক্ষিণ ভারতীয় অক্ষর থেকে নেওয়া। বর্তমান কৃষ্টিধারাতেও হিন্দুত্বের প্রভাব যথেষ্ট। ইন্দোনেশিয়ায় বহু বর্তমান নামে সংস্কৃত মূল সুস্পষ্ট, যেমন সোকার্ণো (সুকর্ণ), সোদের্সোনো (সুদর্শন), ভিরজোসুপের্তো

(বীর্যসুপত্র)—আরো মজার ধরণের জোড়া নামেরও অভাব নেই—যেমন 'মহম্মদ গণেশ।'

সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ইন্দোনেশিয়া বরাবরই অপেক্ষাকৃত 'নিম্নচাপক্ষেত্র'। হাজার দুই বছর আগে যখন ভারতীয়েরা এ দেশে আসে তখন হিন্দু ও বৌদ্ধ কৃষ্টি ও সংস্কৃতি এরা অবলীলাক্রমে মেনে নিয়েছিল। ষোড়শ শতাব্দীতে ইসলামীয় অভিযানের পর সেই সমাজ ও সংস্কৃতির ধারার হয় সম্পূর্ণ বদল। বর্তমানে শতাধিক বৎসরের পাশ্চাত্ত্য আধিপত্যের ফলে সহরবাসীরা প্রায় পুরাপুরি পশ্চিমী বেশভূষা আচার ব্যবহার গ্রহণ করেছে। গ্রামাঞ্চলে এখনো দেশীয় সাজ—সারং ও কোবাইয়ার চলন আছে। যবদ্বীপের লাল টালির চালের ঘর কেরালার চালাঘরের কথা মনে এনে দেয়। বলিদ্বীপের চালাঘরগুলি বাংলাদেশের কুঁড়ে ঘরের মতন। যবদ্বীপ বাসীদের সৌন্দর্যজ্ঞান যে রীতিমত উচ্চস্তরের তার প্রমাণ পরিপাটি ও সুবিন্যস্ত গ্রামগুলি। সহরের বাড়ীরও অধিকাংশের সামনে কতকটা বাগান, বারান্দায় ফুল, অর্কিডের সুষ্ঠু বিন্যাস।

ইন্দোনেশিয়ার জমির উর্বরতা অবিশ্বাস্য রকমের। যবদ্বীপের ক্লাটেন প্রদেশে বছরে চারটা ফসল পাওয়া যায়। অন্য জায়গায় ধান পাওয়া যায় বছরে তিনবার। আগ্নেয়গিরি প্রসূত মাটি ছাড়া পাহাড় থেকে নেমে আসা বর্ষার জলকেও আদিমকাল থেকেই ইন্দোনেশীয়রা চমৎকারভাবে চাষের কাজে সদ্ব্যবহার করছে। এ বিষয়ে তারা চিরন্তন পারদর্শী। আজকাল ঐ জলকে অনেক জায়গায় বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্যও ব্যবহার করা হচ্ছে। পথ দিয়ে, রেলে, উড়োজাহাজে যে ভাবেই চলা হোক এই সেচ ব্যবস্থা নজরে পড়ে। বৃষ্টিজলের অতিরিক্ত অংশটা স্তরে স্তরে নেমে আসা আবাদের পাশ দিয়ে খাল বরাবর নিয়ে যাওয়া হয়েছে নদীর ধার দিয়ে, রেলপথের পাশ দিয়ে—এটা যবদ্বীপের একটা অতি সাধারণ দৃশ্য। পশ্চিম যবদ্বীপের পার্বত্য অঞ্চলে পথের ধারে এখানে ওখানে গাদা করে রাখা দেখা যায়—বাঁধাকপি, ভুট্টা, সিম,

ইত্যাদি নানা তরিতরকারী। কোনো পাহারা নেই—পড়ে আছে—'লরী' এসে তুলে নিয়ে যাবে : দেখে দু'টো জিনিষ বোঝা যায়—জমি কত উর্বর আর অধিবাসীরা কত সৎ।

প্রকৃতির অবদানের মধ্যে সবচেয়ে চোখে ধরে ফুল আর ফল। এ বিষয়ে ইন্দোনেশিয়ার সম্পদ অতুল। দেশটা অর্কিডে ভর্তি। বান্দুং ও মালাংএ দেখেছি গোলাপের জঙ্গল—টকটকে লাল, হল্‌দে আর সবুজে চোখে ধাঁধা লাগে।

কৃষিপ্রধান ইন্দোনেশিয়া শিল্প বিষয়ে অনেকটা পিছিয়ে আছে। সোনা, রূপা, টিন, কয়লা, লবণ ইত্যাদি খনিজ সম্পদে এদেশ সমৃদ্ধ। রাবার, কোকো, সিন্‌কোনা, তামাক, আখ প্রভৃতির বড় বড় আবাদও নজরে পড়ে। প্রথমে পৌঁছেই কিন্তু একটা জিনিষ লক্ষ্য করেছিলাম—সেটা হল চিনির অভাব। খোঁজ নিয়ে জানলাম ১৯৪৭ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধে চিনির কারখানাগুলি ছিল ওলন্দাজদের ঘাঁটি এবং বিদ্রোহীরা এগুলি ধ্বংস করে ফেলে। এখনও গ্রামাঞ্চলে বহু জায়গায় পোড়া কারখানার কালো কাঠামোটা পড়ে আছে। ওলন্দাজরা চলে গেলে পরে আর কেউ কারখানাগুলিকে নূতন করে চালু করতে এগিয়ে আসেনি।

যবদ্বীপের বড় বড় সহর হল জাকার্তা, বান্দুং, সেমারাং, যোগ্যকর্তা ও সুরবায়া। ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী জাকার্তার সরকারী আফিস-বাড়ী, ব্যাংক, বড় বড় পার্ক, সুন্দর প্রত্নতাত্ত্বিক ও নৃতাত্ত্বিক যাদুঘর, সুদৃশ্য পোতাশ্রয় ইত্যাদি দর্শনীয়। ব্যবসা প্রধানতঃ চীনা ও ভারতীয়দের হাতে। জাকার্তায় আরেকটি লক্ষ্য করবার বিষয় হ'ল রাস্তায় গাড়ীর ভীড়। ওখানকার লোকেরা দাবী করে, এশিয়ার মধ্যে টোকিও ছাড়া কোনো শহরে এত মোটরগাড়ী নেই। গাড়ী ছাড়া ট্যাক্সি, বাস, পেচা (সাইকেল রিক্সা) এবং সহরতলীর জন্য বৈদ্যুতিক রেল চলে।

বান্দুং সহর পশ্চিম যবদ্বীপে সমুদ্র থেকে দু' হাজার ফুট উঁচুতে

পাহাড়ে ঘেরা, আবহাওয়া নাতিশীতোষ্ণ। এখানে ভূতত্ত্ব সংগ্রহশালা ও কলাবিদ্যালয় আছে। নিকটেই 'বস্কা' নিরীক্ষণ কেন্দ্রে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সবচেয়ে বড় দূরবীক্ষণ যন্ত্র। জাকার্তা ও বান্দুং-এর মধ্যে নগরে ১০০ একর ব্যাপী একটি অতিকায় উদ্যান আছে। ঐখানেই প্রাণিতত্ত্ব সংগ্রহশালায় রাখা আছে ঐ দ্বীপের অদ্ভুত সরীসৃপ কোমোডো —৯ ফুট লম্বা টিকটিকি। বান্দুং থেকে সুরম্য পথ বরাবর ঘণ্টাখানেকের মোটর পথে 'টাং কুবান প্রাহু' নামে একটি পাঁচ হাজার ফুট উঁচু আধাসক্রিয় আগ্নেয়গিরিতে পৌছানো যায়। এর বিরাট গহ্বর সম্বন্ধে বহু কিম্বদন্তী আছে। মধ্য ও পূর্ব যবদ্বীপের বড় বন্দর হল যথাক্রমে সোমেরাং ও সুরাবায়া।

যবদ্বীপের সাংস্কৃতিক রাজধানী যোগ্যকার্তা থেকে সহজেই ডিয়েম, বোরোবুহুর, প্রাম্বানান প্রভৃতি যবদ্বীপের বিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক দ্রষ্টব্য-গুলিতে পৌছান যায়। এই যোগ্যকার্তা, 'বাতিকের' কাজ, যবদ্বীপের প্রাচীন নৃত্য ও ওয়াং ফুলিং (ছায়ানৃত্য) এবং রূপার সূক্ষ্ম কাজের জন্য খ্যাত।

ইন্দোনেশিয়ার পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে জোগ্যকার্তার জগমদ বিশ্ববিদ্যালয় সবচেয়ে বড়। এখানে ছাত্রসংখ্যা পনের হাজার। ওলন্দাজ শাসনকালে সমস্ত যবদ্বীপে ছাত্র সংখ্যা ছিল দু'লক্ষেরও কম। ছাত্র সংখ্যা বিশেষতঃ উচ্চশিক্ষা পর্ষদে গত দশ বছরে যে দ্রুত বেড়ে চলেছে সেটা বিশেষ আশার কথা। যবদ্বীপ ও বলির সহরগুলির মধ্যে যোগাযোগের জন্য সুন্দর পাকা রাজপথ আছে।

দৈনন্দিন ব্যবহারের জিনিষ তৈরীতেও চারুকলার যথেষ্ট প্রকাশ দেখলাম। সরকারও শিল্পকলার পৃষ্ঠপোষক। যোগ্যকার্তা ও সুরকার্তা এখনও 'বাতিকের' কাজ, কচ্ছপের খোলস ও বিভিন্ন ধাতুর সূক্ষ্ম কাজের জন্য খ্যাত। সেমারাং ও অন্যান্য বহু জায়গায় সুন্দর কাঠের কাজ ও বেতের বোনা হয়। অরণ্য শামলিমার বহুরূপী প্রাচুর্যের মধ্যে বাস করে এদের লোকে নানা রংএর ভক্ত। তার প্রমাণ এদের ঘর

সাজানোয়, বোনা কাপড়ে, ওয়াং পুতুলে, চামড়ার কাজে।

বহুকালাবধি এই সহস্রমন্দিরের দ্বীপ পর্যটকদের মন ভুলিয়েছে। এই দ্বীপের বহু নামকরণ করেছেন বিদেশী লেখকদের দল। কেউ বলেছেন 'স্বর্গের দ্বীপ', কেউ 'উষ্ণমণ্ডলের মণি' আরো কত কি। আমাদের প্রধান মন্ত্রী জহরলাল ১৯৫৪ সালে বলিদ্বীপকে বলেছিলেন, ঐ দ্বীপ 'জগতের উষা'। ইন্দোনেশিয়ারা বলে, এ হল 'পুলাও দেওতার' —দেবতার দ্বীপ।

বলিদ্বীপে দেখবার এত কিছু আছে! সহরে গ্রামে, পাহাড় পর্বতে, সমুদ্রসৈকতে অজস্র সুশোভিত মন্দির। স্তরে স্তরে নেমে আসা ধান জমি, আগ্নেয়গিরি, হ্রদের নৈসর্গিক শোভা, জগৎ ভোলানো নৃত্য; কাঠ ও পাথরের উপর নিখুঁত কারুকার্য, এর বিচিত্র চারুশিল্প—আর সর্বোপরি শান্ত অতিথিপরায়ণ অধিবাসী। রূপরস, সঙ্গীত, নৃত্যমাধুরী এদের সব মজ্জাগত। এরকমটা একমাত্র বলিদ্বীপেই সম্ভবপর। সর্বজন-পূজ্য 'গুনুং আগুং' গিরিশিখর বলির কৈলাস পর্বত—শিব-পার্বতীর আসন। এরই কোলে বলির সবচেয়ে পুরানো মন্দির, দশম শতাব্দীর 'বেসাখী' বা বাসুকী।

১০ই জানুয়ারী ইন্দোনেশীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার প্রথম বক্তৃতা। সেদিন সমস্ত 'ফ্যাকালটি অব্ আর্টস'এ ওরা ছুটি দিয়েছিল, প্রায় দু'শ তিন'শ ছাত্রছাত্রী উপস্থিত ছিল। 'ল্যাণ্টার্ন স্লাইড' সহযোগে ইংরাজী বক্তৃতা অনুধাবন সহজেই করতে পেরেছিল, দেখলাম ইংরাজী বেশ ভালই শিখেছে। সভাপতি বক্তৃতা শেষে বললেন যে, তাঁরা আমার কাছ থেকে সেদিন যা শুনলেন ইন্দোনেশিয়া শিল্প ও সংস্কৃতির ভারতীয় উৎস সম্বন্ধে তাতে মনে হয় ইন্দোনেশীয় ইতিহাস নতুন করে রচনা করতে হবে। বিদায়কালে সমবেত ছাত্রছাত্রীদের বললাম, তোমাদের অধ্যাপক ডঃ সুজীপ্ত আমার ছাত্র আর তোমরা যারা সুজীপ্তের ছাত্র তারা আমার নাতির মত, কি বল? শুনে তারা হো হো করে হেসে উঠল। বড় হাসিখুসী ভরা এই জাত।

মাঝে একদিন জাকার্তা থেকে ৩০ মাইল দূরে পশ্চিম জাভার শৈলমালার কোলে সুরম্য বোনোর নগরীতে ঘুরে এলাম। ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেণ্ট সুকর্ণর এখানে একটি সুন্দর গ্রীষ্মাবাস আছে। চারিদিকে পদ্মপুকুর ঘেরা, বাগানে হরিণ যূথ ইতস্ততঃ বিচরণ করছে। সুকর্ণর দ্বিতীয়া পত্নী হাতিনী এখানে থাকেন। বোনোরে একটি ছোট কিন্তু সুন্দর 'জুলজিক্যাল মিউজিয়ম' আছে। এখানে টিকটিকি জাতীয় বিরাট ৯ ফুট লম্বা কমোডো রক্ষিত আছে—প্রাগৈতিহাসিক জীবের বংশধর। পৃথিবীর মধ্যে মাত্র সুমাত্রা জাভার আশেপাশে এদের এখনও দেখা যায়। কিন্তু বোনো বিখ্যাত তার বোটানিকাল গার্ডেন'এর জন্য, সারা এশিয়ার মধ্যে সবচেয়ে বড়—১০০০ একর জমি। মোটরে করে বাগানের মধ্যে ঘুরতেই একঘণ্টার উপর লেগে গেল। পাহাড় পর্বত, নদী ঝরণা, গভীর অরণ্যের ভিতর দিয়ে এঁকে বেঁকে রাস্তা চলে গেছে অতি মনোরম পরিবেশের মধ্য দিয়ে, ওক্, সিডার, দেবদারু, অশত্থ, বট ইত্যাদি বৃক্ষকুঞ্জের বৈজ্ঞানিকভাবে সাজান স্তরের মধ্যে দিয়ে যেমন ভাবে চিড়িয়াখানায় পশুপক্ষীর বেষ্টনী দেখা যায়। অদ্ভুত লোক এই বাগানের ডিরেক্টর ডঃ কোস্টরিমানস। ইনি জাতিতে ওলন্দাজ হলেও অপরাপর দেশবাসীর মত ইন্দোনেশিয়া স্বাধীন হবার পর জাভা ছেড়ে চলে যাননি। পঞ্চান্ন বছরের শুভ্রকেশ। আজন্মব্রহ্মচারী এই বৃদ্ধ যৌবনকাল থেকে উৎসর্গ করেছেন ইন্দোনেশিয়া ও বিজ্ঞানের সেবায় জীবন। বাড়ীতে পনেরটি অনাথ ইন্দোনেশীয় ছেলেকে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করছেন নিজের খরচায়, বাকী সময়টা বাগানে কাটান রোদবৃষ্টি জল ঝড় উপেক্ষা করে বৃক্ষতত্ত্বের অনুধাবনে।

কিন্তু জাকার্তায় এই ১৪ দিনের বেশীর ভাগই কাটালাম এখানকার প্রত্নতাত্ত্বিক ও নৃতাত্ত্বিক সংগ্রহশালায়। দিনের পর দিন ঘুরেছি আর ফটো তুলেছি, এর ঘরে ঘরে, বারান্দায়, উঠানে, বাড়তি মালের নিভৃত প্রকোষ্ঠে। জীবন সার্থক হোল এতদিন ধরে যার ছবি দেখে ও দেখিয়ে এসেছি, সেগুলির মূর্তরূপ সচক্ষে দেখে প্রাণভরে—চণ্ডী

বাননের অগস্ত্য ও বিষ্ণু, বোরোবুদুরের বুদ্ধ, প্রাম্বানানের নরকপাল শোভিত জটামুকুটধারী শিবের মাথা, জাকার্তার কাছে পাওয়া রাজা পূর্ণবর্মনের ও বোর্নিওতে পাওয়া রাজা মূনবর্মনের ৪র্থ-৫ম শতকের সবচেয়ে পুরাতন সংস্কৃত শিলালিপি দেখে। অভিভূত হয়ে গেলাম এই সুদূর অতীত ভারতের অবিনশ্বর স্বাক্ষরগুলি দেখে। জাকার্তা মিউজিয়মের পাথর ও ব্রোঞ্জ, সোনা ও রূপার অপূর্ব ভাস্কর্য নিদর্শন-গুলি দেখে অবাক হয়ে গেলাম। ৭ম শতাব্দীর মধ্য জাভার চণ্ডী-বাননের সুমহান অগস্ত্য মূর্তির ত্বকের সূক্ষ্ম, কমনীয় ও পরস্পর সংযুক্ত সাবলীল রেখাগুলি দৃঢ় মাংসপেশীর ও অন্তর্নিহিত প্রাণশক্তির পরিচয় দেয়। ভারতীয় ভাবনার অনুসরণে রূপায়িত মূর্তিটিতে সজীব পেশী সঞ্চারের বদলে কল্পনার বিমূর্ত চেতনায় পর্যবসিত। তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কমনীয় রেখার স্বাভাবিক অথচ নিয়মিত গতি সুডৌল আয়তনের অনৈস্বর্গিক স্ফীতির আভাস দেয়। চণ্ডী-বাননের সমসাময়িক আর একটি পাথরের বিষ্ণু মূর্তিতে ঐ ধরনের যোগাবস্থার শান্ত গম্ভীর মানসিক সমতার প্রতীকরূপ পাওয়া যায়। এই দুটি মূর্তিতেই ভারতীয় গুপ্ত ও পল্লব রীতির ছাপ সুস্পষ্ট। এই শিল্পরীতিতে অসীম সংযম ও ঐক্যবদ্ধ সংহতি ও রেখার অপ্রতিহত ছন্দ-বোধ আছে। এই দুই শিল্পরীতির অপূর্ব সমন্বয় হয়েছে ইন্দোনেশিয়ার ৭ম-৮ম শতাব্দীর ধ্রুপদী শিল্পধারার মাধ্যমে। আশ্চর্যের বিষয় ভারতবর্ষে এমন সুন্দর মূর্তি দুর্লভ। কিন্তু পরবর্তীকালে পূর্বজাভার শিল্পরচনায় এই ধরনের রৈখিক ছন্দোচেতনা ও প্রাণশক্তিকে যেন হারিয়ে ফেলেছে।

জাকার্তা মিউজিয়মে সংরক্ষিত মূর্তিগুলির মধ্যে ব্রোঞ্জের তৈরী ৫ম-৬ষ্ঠ শতকের বোর্নিও ও সেলিবিসের দুটি অনন্য দাঁড়ান বুদ্ধ মূর্তি সবচেয়ে পুরাতন। এদের মধ্যে দক্ষিণ ভারতের কৃষ্ণা-গোদাবরী অঞ্চলের অমরাবতী শিল্পধারার প্রভাব সবিশেষ প্রতীয়মান। দর্শকের দৃষ্টি স্বভাবতই আকৃষ্ট হয় এদের অনৈস্বর্গিক সৌন্দর্যে। এছাড়া সুমাত্রার পানেমপৎ-এ পাওয়া কয়েকটি মূর্তি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। একটি

আট ফুট উঁচু বিরাট অবলোকিতেশ্বর মূর্তি তাদের মধ্যে সবচেয়ে সেরা। পাথরে কাটা এই বোধিসত্ব মূর্তির সঙ্গে পল্লবযুগের শিল্পশৈলীর যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। দেহের নমনীয় গঠন, বক্ষোদেশের স্ফীতি, অধোদেশের ক্রমশঃ ঢালু ক্ষীয়মান ভাব, মাথার দীর্ঘাকার জটামুকুট সবই মনে করিয়ে দেয় মাদ্রাজের মামল্লপুরের ৭ম শতাব্দীর শৈলতক্ষণ রীতি। সংহৃত আধ্যাত্মিক শক্তির স্ফুরিত আধার সুমাত্রার এই অলৌকিক সাধন প্রতিমা।

জাকার্তার কাজ শেষ করে রেলপথে বান্দুং যাত্রা করলাম। ভোরে বেরিয়ে তিনঘণ্টা ধরে চললাম, **'Pullonak coach'**-এ করে এই রেলপথে বড় বড় পাহাড় ভেদ করে বা গা বেয়ে। চারিদিকে অপূর্ব দৃশ্য। বৃষ্টি তখনও বেশ হচ্ছে, পাহাড়গুলির মাথা সব মেঘে ঢাকা, কোথাও তুলার মত হালকা মেঘগুলি পাহাড়ের গা বেয়ে ঝরে পড়ছে ঝরণার জলের মত। কখনও আমাদের রেলগাড়ী সাপের মত এঁকেবেঁকে নারিকেল ও কলাগাছ বোঝাই পাহাড়ের ধারে ধারে চলেছে, হঠাৎ দেখি চেয়ে পুলের উপর দিয়ে যাচ্ছি, আর খরস্রোতা নদী আমাদের অন্তত ৫০০ ফুট নীচে উদ্দাম তালে নেচে চলেছে। এতটুকু পাহাড়ের পুলের উপর দিয়ে কখনও যাইনি। এক জায়গায় দেখলাম পুলের নীচে কয়েকখানি তৈলবাহী মালগাড়ী পড়ে আছে। কয়েকদিন আগেই ভূমিধ্বস্ নেমেছিল। বান্দুং পেঁাছিয়েই শুনলাম ঐ রাস্তায় আর রেল চলবে না কয়েকদিন, এত বিপজ্জনক। দূরে এবং কাছে অসংখ্য ঝরণা, পাহাড় থেকে পাহাড়ে লাফিয়ে পড়ছে। সবচেয়ে মজা লাগল পাহাড়ের মাথায় অজস্র নারিকেল ও কলাগাছের বন দেখে। শুনেছি দাক্ষিণাত্যে কেরলেও নাকি এরকম দেখতে পাওয়া যায়।

বান্দুং শহরের পরিবেশ ও প্রাকৃতিক দৃশ্য অত্যন্ত মনোরম। সহরটি ছোট হলেও অত্যন্ত সুন্দর এবং এখানকার মেয়েরাও সুন্দরী। বিস্তীর্ণ উপত্যকায় সহরটি ছড়িয়ে পড়েছে, চারিদিকে পর্বত প্রাচীর। রাস্তাঘাটগুলির দুধারে সুদৃশ্য বড় বড় গাছের সারি পপ্‌লারের মত

ছুঁচাল মাথা। বাড়ীগুলি ফুলে পরিপূর্ণ। এরকম ফুলের সমারোহ কোথাও কখনও দেখিনি। গোলাপ ছাড়া নানারকম পাওয়া 'অর্কিড' পাওয়া যায়, দাম অত্যন্ত সস্তা। কলকাতায় নিউ মার্কেটে এক একটি গ্লাডিয়োলি'র ডাঁটা কখনও কখনও এক টাকায় বিক্রয় হয়—এখানে গ্লাডিয়োলি'র গুচ্ছ মাত্র আট আনা। ফুলেরই বাজার কতগুলি। অনেক আমেরিকান ও জার্মান পরিবার দেখলাম Jag Hill-এর ঢালুগায়ে পুষ্পলতা ঘেরা ছোট ছোট কাঠের বাড়ীতে সুখে বাস করছেন সামনে প্রকৃতির অনন্ত সম্ভার। দেখে হিংসা হচ্ছিল মনে মনে। আমরা যে হোটেলে উঠেছিলাম হোটেল স্যাভয় সেটি ধর্ম নির্মলার চেয়েও বড় ও অত্যাধুনিক, ঢের ভাল সাজান হালফ্যাসানের। জাকার্তার মত বান্দুংএও মেয়েরা ফ্রক পরে সকলে সাইকেলে চড়ে। আশুতোষ মিউজিয়মের জন্য কয়েকটি চমৎকার কাঠের 'ওয়েয়াং পুতুল' কিনলাম, পশ্চিম জাভার ঢংএ তৈরি। বক্তৃতা দিলাম দুটি'—একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের 'টিচার্স-ট্রেনিং কলেজ'-এর নতুন সৌধে আর একটি কলেজ অব আর্টস অ্যাণ্ড ক্রাফ্‌টস-এ।

বান্দুং থেকে ফিরে এলাম মোটরে জাকার্তায়; চিম্‌পুরের ৩০০০ ফুট উচু স্বাস্থ্যনিবাস হয়ে ক্রমাগত পাহাড়ের গায়ে আঁকাবাঁকা রাস্তা দিয়ে, কারণ রেল বন্ধ। জাকার্তা থেকে 'গরুড় এয়ারওয়েজ'-এর বিমানে, পূর্ব জাভার প্রধান বন্দর সুরাবায়াতে একঘণ্টা বিশ্রাম করে একেবারে সরাসরি বলিদ্বীপের রাজধানী ডেন্‌পাসারে পৌঁছলাম। বলিতে আট দিন। বলির আর এক নাম 'মন্দির দ্বীপ' আগেই বলেছি। সত্যি এমন মন্দিরের ছড়াছড়ি উত্তর ভারতে ভুবনেশ্বর ছাড়া আর কোথাও দেখিনি। পথে ঘাটে নদী পর্বতে চারিদিকে মন্দিরে ও কারুকলার দোকানে মূর্তি। প্রত্যেক বাড়ীতে গৃহদেবতার মন্দির ও প্রাচীর তোরণ নানা কারুকার্য খচিত, ভারত থেকে পাওয়া কীর্তিমুখ, মকর, গরুড় প্রভৃতি নানা অলঙ্কার দিয়ে। গ্রাম্য সভা, গ্রাম্য মন্দির, দোকান, হোটেল সব কিছুরই পুরোভাগে রয়েছে প্রাণবান দ্বারপাল

মূর্তি প্রাচীন ভারতীয় রীতি ও ইন্দোনেশিয়া রীতি অপূর্ব সংমিশ্রণে রূপায়িত। আমাদের দেশে যা অবলুপ্ত হয়ে গেছে, বলির অধিবাসীরা এখনও সযত্নে বুকে করে রেখেছে হিন্দুধর্ম আচার অনুষ্ঠানের সবকিছুই। সন্ধ্যাবেলা সারি সারি সুবেশা গ্রাম্য মেয়েরা নিয়ে যায় অর্ঘ্য-নৈবেদ্যের ডালি প্রতিমাহীন মন্দিরে, পূর্বপুরুষের আত্মার পূজার জন্য। বিশেষ বিশেষ পার্বণ উপলক্ষে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের মূর্তিকে অধিষ্ঠিত করা হয়। মন্দির প্রাঙ্গণে নিয়মিত অনুষ্ঠান হয়, রামায়ণ মহাভারত সমন্বিত অবিস্মরণীয় নৃত্যনাট্যের। যেমন হোত প্রাচীন ভারতে। ডেনপাসার থেকে ৭০ মাইল দূরে কারাং নাসেমের রাজা নিমন্ত্রণ করলেন ২০০ বছর পরে অনুষ্ঠিত ঋষি যজ্ঞ দেখতে। রোমাঞ্চ হল শরীরে ১৫০ বৌদ্ধ ও শৈব পুরোহিত একসঙ্গে সংস্কৃত মন্ত্র উচ্চারণ করে যজ্ঞে আহুতি দিচ্ছেন দেখে। যজ্ঞক্ষেত্রে শোভাযাত্রার সর্ব পুরোভাগে আমার আসন নির্দিষ্ট হোল—ভারতবর্ষ থেকে গুরু এসেছেন —সকলে সসম্মানে অভিবাদন করলেন আমাকে।

আবার পূর্বজাভায় ফিরে এলাম বিমানে। সুরবায়া থেকে রেলে মানাং। এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা হোল এবং মানাংকে কেন্দ্র করে ১০০ মাইলের মধ্যে যত মন্দির ও পুরাকীর্তি আছে সব মোটরে ঘুরে দেখলাম—সিংহসারী, চণ্ডী জাগো, চণ্ডী কিডাল, চণ্ডী মানাতারান প্রভৃতি পূর্বজাভার সন্নিহিত রাজ্যের গৌরবগুলি; মোজোকর্তো ও ট্রাউনলের মিউজিয়ম, বিশেষ করে কারাঙ্গোটাসের বিখ্যাত গণেশ মূর্তি, সিংহসারীর বিশালায়তন দ্বারপাল (১৩শ শতাব্দী) ও বেনাহাগের গরুড়বাহন বিষ্ণুরূপী মহারাজ ঐর্লঙ্গের অনবদ্য প্রতিকৃতি (১১শ শতাব্দী)। তারপর মধ্য জাভার সাংস্কৃতিক কেন্দ্র যোগ্যকর্তায় এগার দিন কাটালাম। এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে দিলাম তিনটি বক্তৃতা। প্রত্নতাত্ত্বিকের কাছে যোগ্যকর্তা একটি প্রধান তীর্থস্থান। ৩০ মাইলের মধ্যে চারিদিকে ছড়ান রয়েছে হাজার বছরের পুরাকীর্তি—অষ্টম শতাব্দীর জাভার স্থাপত্য শিল্পের মুকুটমণি চণ্ডী

কলসন, মঞ্জুশ্রী বোধিসত্বকে উৎসর্গিত পাহাড়পুরের অনুকরণে তৈরী চণ্ডী সেউ, চণ্ডী সারী, চণ্ডী প্লাওসন অর্ধ-প্রস্ফুটিত পদ্মের মত বিশ্ব-বিশ্রুত বোরোবুদুর ও তার ৫২০টি স্বর্গীয় বিভূতি মণ্ডিত ধ্যানী বুদ্ধ। নবম শতাব্দীর হিন্দুশক্তির পরম প্রকাশ—প্রাম্বানানের বিশালায়তন শিব মন্দির যার ধ্বংসস্তূপ থেকে সেদিন নতুন করে তৈরী হয়েছে মন্দির চূড়া, ২০০ ফুট উঁচু। তিরিশ বছর ধরে যার ছবি দেখে ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের দেখিয়ে তৃপ্ত হয়েছি—স্তম্ভিত অভিভূত হলাম বিস্ময়ে যেমন হয়েছে যুগযুগ ধরে কত অগণিত ভক্ত তীর্থযাত্রী সৌন্দর্য-পিপাসু—১৮ ফুট একখানি পাথরে কাটা বিরাট সুমহান বুদ্ধ ও দুপাশের দুই সঙ্গী বজ্রপাণি ও পদ্মপাণি দেখে।

দ্বিপত্র করে তিনটা পাহাড়ের মালা ডিঙ্গিয়ে ডিয়েং উপত্যকাব ৭ম শতাব্দীর সর্বপ্রাচীন ভারতীয় কীর্তি চণ্ডী, যুধিষ্ঠির, অর্জুন, ভীম, দ্রৌপদী, সুভদ্রা, ঘটোৎকচ প্রভৃতি ছোট ছোট শৈবমন্দির দর্শন করে আবার ফিরলাম জাকার্তায়। তারপর ২৩শে ফেব্রুয়ারী B. O. A. C. 'জেট'কে আশ্রয় করে দমদমের বিমানঘাটিতে অবতরণ করলাম ভোরের আলোয়। যখন উড়ে আসছি কেবলই ভাবছি, দু'হাজার বছর আগে আমাদের পূর্বপুরুষরা জীবন বিপন্ন করে কত ঝড়ঝঞ্ঝা বিপদাপদকে অগ্রাহ্য করে মহাসমুদ্র অতিক্রম করতেন, কত মাস বছর ধরে। ভারতের ধর্ম ও সংস্কৃতির ধ্বজা বহন করে আর আজ আমি তাদের নগণ্য সন্তান তাদেরই অমর কীর্তি চিহ্নিত তীর্থগুলি পরিক্রমা করে অনায়াসে ফিরলাম জাকর্তা থেকে কলকাতায় পাঁচ ঘণ্টায়। ডিয়েং উপত্যকায় সঙ্গীদের বারণ না মেনে নেমেছিলাম ৬,৫০০ ফুট উচু ফুটন্ত লাভা ও গন্ধকের আধার ধূমায়মান আগ্নেয়গিরির ভিতরে, ফেরবার সময় প্রায় গন্ধর্ব লোক দিয়ে উড়ে এলাম—আকাশ ও পাতাল দুইই স্পর্শ করতে পেরে জীবন হল ধন্য।

ইন্দোনেশিয়ার শিল্প ও সংস্কৃতি

ঐতিহাসিক যুগে ভারত-সংস্কৃতির আলোক দেশজ সীমানার বাইরে বহুদূর ছড়িয়ে পড়েছিল। বৃহত্তর ভারতের দেশগুলি, ইন্দোনেশীয়-দ্বীপমালা, চীন ও জাপান অর্থাৎ প্রশান্ত মহাসাগরের তরঙ্গবিধৌত সব দেশই পশ্চিমের এই আলোক দ্বারা উদ্ভাসিত হয়েছিল কোন না কোন সময়ে। ছোট ছোট মণিগ্রথিত মালার মত প্রায় এক হাজার মাইল বিস্তৃত ইন্দোনেশিয়া পৃথিবীর বৃহত্তম দ্বীপপুঞ্জ। এই দ্বীপমালার বিচিত্র দৃশ্যাবলী সত্যই নয়নাভিরাম। সবুজ শ্যামলিমা আবৃত এই দ্বীপগুলি আগ্নেয়গিরি, সুউচ্চ গিরিশ্রেণী, মনোরম উপত্যকা, হ্রদ ও জলপ্রপাতে ঘেরা। বলি ও যবদ্বীপ বিচ্ছুরিত সৌন্দর্য নিয়ে এই সমস্ত দ্বীপমালার মুকুটমণি। ইন্দোনেশীয় সরকারের আমন্ত্রণে এই দুই দ্বীপের বিশ্ব-বিদ্যালয়সমূহে বক্তৃতা দিবার জন্য আমি ভারত সরকার দ্বারা প্রেরিত হয়েছিলাম। ইন্দোনেশিয়ার অপূর্ব সৌন্দর্যসম্ভারে ও অগণিত মূর্তি মন্দিরে ভারতের অবিনশ্বর স্বাক্ষর দর্শন করার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল তখন। ত্রিস বৎসরের স্বপ্নসাধনা সার্থক হয়েছিল এই পরিভ্রমণে।

খৃস্টীয় শতকের প্রারম্ভ থেকে ১৫শ বছর ধরে ভারত ও ইন্দোনেশিয়ার মধ্যে সংস্কৃতি বিনিময়ের যে সমস্ত নিদর্শন পাওয়া যায় তার মধ্যে সবচেয়ে দৃষ্টিগ্রাহ্য ও কৌতূহলোদ্দীপক হ'ল ইন্দোনেশিয়ার শিল্প ও ভাস্কর্য। ইন্দোনেশীয় শিল্পের গঠনরীতি এবং তার বিষয়বৈভব, চিত্র ও মূর্তিকলা-শাস্ত্রের রীতি, পরিকল্পনাকৌশল, ভঙ্গিমা এ-সমস্তই ভারতীয় শিল্পের প্রতিরূপায়ণ। অবশ্য দেশজ কল্পনাও এরই সঙ্গে মিশে গিয়ে একে আরও দীপ্তি দিয়েছে। ইন্দোনেশীয় শিল্পের গড়ে ওঠার ও তার বিবর্তনের উৎসপ্রেরণা প্রাচীন জগতের দুটি সভ্যতার ক্রমাগত আসঙ্গের মধ্যে। রাজন্য-বিভূষিত সামাজিক পরিবেশ, বৌদ্ধধর্ম ও

হিন্দুধর্মের সংস্পর্শে এই সৃষ্টিশীল বিবর্তন সম্ভব হয়েছিল।

খ্রীস্ট-শতকের প্রথম অর্দ্ধেই ভারতীয়রা ওখানে বসবাস আরম্ভ করেন। বণিক শ্রেণী, রাজপুত্র, ব্রাহ্মণ ও শ্রমণদের উপবসতির পরই সাংস্কৃতিক প্রভাবগুলি বিশেষভাবে কার্যকরী হ'য়ে ওঠে। পশ্চিম-জাভার ও বোর্নিয়োর পূর্ণবর্মনের ও মূনবর্মনের শিলালিপিই সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ও প্রাচীন নিদর্শন। বুদ্ধের প্রাচীন মূর্তিও ইন্দো-নেশিয়াতেই পাওয়া গেছে। ইন্দোনেশিয়া, ইন্দোচীন, শ্যাম, মালয়, বর্মা এইসব দেশের সমস্ত প্রাচীনতম বুদ্ধমূর্তিই দাক্ষিণাত্যের কৃষ্ণা-অঞ্চলের প্রভাবে অনুপ্রাণিত। ভারতীয় ভাবধারার আদিমতম প্রবাহ দাক্ষিণাত্যের সমগ্র পূর্বতীর থেকেই ইন্দোনেশিয়ায় পৌঁছেছিল। অন্ধ্র-কলিঙ্গের অমরাবতী অঞ্চলের প্রভাবের পর নূতন তরঙ্গ আসে পল্লব রাজত্ব থেকে এবং তারপর আসে সুদূরদক্ষিণের চোল সাম্রাজ্য থেকে। এছাড়া পশ্চিম ভারতের নৌ-যাত্রার কেন্দ্রস্থল গুজরাটের নামও উল্লেখযোগ্য। ইন্দোনেশিয়ার সঙ্গে তার সম্পর্কও সুপ্রাচীন। এইখান থেকেই ১৫শ' শতকে হিন্দু-ইন্দোনেশিয়ায় ইসলামধর্ম ছড়িয়ে পড়ে। পশ্চিম দাক্ষিণাত্যের এই অন্তর্বর্তী প্রদেশে, মহারাষ্ট্রে ও কানাড়ায় গুপ্তসাম্রাজ্য ও চালুক্যরাজ্যের বিরাট গিরিগুহা ও মন্দিরগুলি—অজন্তা, ইলোরা, অইহোল এবং পট্টডকল। এরই স্থাপত্য-ভাস্কর্যের ধারা পূর্ব ও পশ্চিমের নানা বৌদ্ধ শিল্পকেন্দ্রের প্রভাবও ইন্দোনেশিয়ায় পড়েছিল। এই সমস্ত নানা উপাদানের মাধ্যমে এবং উত্তরভারতের মথুরা ও সারনাথের শিল্পানুবর্তনের প্রভাবেও ইন্দোনেশিয়ায় গন্ধারের হেলেনীয় শিল্পকলার সূক্ষ্মতম উপাদান উপনীত হয়েছিল। গুপ্তসাম্রাজ্য ও তৎপরবর্তীকালে হর্ষবর্ধনের সময়ে গুজরাট থেকে বাংলা পর্যন্ত বিস্তৃত সাম্রাজ্যের বিখ্যাত বন্দরগুলি, যথা পশ্চিমে ভারুকচ্ছ ও পূর্বে তাম্রলিপ্ত এবং কলিঙ্গ-উড়িষ্যার বন্দরগুলির সাথে এই দূরবর্তী দ্বীপপুঞ্জ ক্রমাগত সাংস্কৃতিক সংস্পর্শে আসতে থাকে।

কোন কোন পণ্ডিতের মতে যবদ্বীপের প্রসিদ্ধ শৈলেন্দ্র রাজবংশের

সঙ্গে উড়িষ্যার শৈলোদ্ভব রাজবংশের ঘনিষ্ঠতা সম্পর্ক রয়ে গেছে। ইতিহাসের হিন্দু-ইন্দোনেশীয় পর্বের অধিকাংশ সময়েই উত্তর-পূর্ব ভারতের এক বিরাট অংশ ও প্রাচীন গৌড়ই ভারতীয় সাংস্কৃতিক প্রভাবের উৎস ও মূল প্রেরণাদাত্রী ছিল। এই সময়েই পবিত্র বৌদ্ধ কেন্দ্রগুলি গড়ে উঠেছিল এবং নানা বৈদেশিক পরিব্রাজকদেরও উপস্থিতি ঘটেছিল। এই অঞ্চলে গড়ে উঠেছিল বিখ্যাত নালন্দা বিশ্ব-বিদ্যালয় ও মঠ। অষ্টম-দ্বাদশ শতাব্দীর তান্ত্রিকতা ও পাল-সেনীয় শিল্প-রীতি উত্তরকালে বিশেষ প্রভাববিস্তার করেছিল। সমগ্র বৌদ্ধজগতে এটা এক বিশেষ উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। এই তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম ও পাল-সেনীয় শিল্পরীতি শুধু ভারতেই নয়, সিংহল, নেপাল, তিব্বত, চীন, জাপান এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশে দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। বিশেষ করে পালশিল্পরীতি সারা এশিয়ার শিল্পচর্চায় একটা ছাপ রেখেছিল এবং সেই শিল্পধারা গন্ধারের হেলেনীয় প্রভাবের চেয়ে অনেক বেশী শক্তিশালী। ৭ম থেকে ১৪শ শতকে মধ্য ও পূর্ব যবদ্বীপের ইতিহাসের এই বিস্তৃত পর্বে দেখা যায় যে ভারতীয় ধর্মপ্রচারকেরা ইন্দোনেশিয়ায় ক্রমাগত ধর্মপ্রচার উপলক্ষে পদার্পণ করেছেন। আরও সন্ধান মেলে যে অন্যতম বিখ্যাত বৌদ্ধগুরু কাশ্মীরের রাজপুত্র গুণবর্মন সুবর্ণদ্বীপে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন। ৫ম শতাব্দীতে ইন্দোনেশীয় দ্বীপপুঞ্জের নাম ছিল সুবর্ণদ্বীপ। অন্যান্য ধর্মপ্রচারকের মধ্যে কাঞ্চীর অধিবাসী ও নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ধর্মপাল (৭ম শতাব্দী), গৌড়রাজপরিবারের কুলগুরু কুমার-ঘোষ (৮ম শতাব্দী), দাক্ষিণাত্যের বৌদ্ধভিক্ষু বজ্রবোধি এবং তাঁর শিষ্য অমোঘবজ্র যিনি সিংহল থেকে চীনের পথে পাঁচ মাসের জন্য সুমাত্রা বা 'শ্রীবিজয়ে' ছিলেন এবং শেষ বৌদ্ধগুরু নালন্দা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের আচার্য শ্রীঅতীশ দীপঙ্কর ১১শ শতাব্দীতে এসে ছিলেন। এ-ছাড়া আরও বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ ধর্মপ্রচারকদের নাম পুঁথি ও শিলা-লিপিতে পাওয়া যায়। বোরোবুদুর, সেউ, কিম্বা লারাজংরং-এর জটিল

স্থাপত্য অথবা 'মেন্দুতে'র মূর্তি গঠনপদ্ধতি জানতে গেলে বৌদ্ধ ও শৈব ধর্মীয় পুঁথি এবং প্রাচীন ভারতীয় ভাবাদর্শ ও প্রতীকীবাদ এমন কি এখানকার কিছু কিছু স্থাপত্যের সঙ্গে সম্যক পরিচিতি দরকার। ভারতীয় স্থপতি ও শিল্পীদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতাতেই ইন্দোনেশিয়া হয়ে উঠেছিল বৌদ্ধচর্চার একটি বৃহৎ কেন্দ্র। নালন্দা ও বিক্রমশিলার সমকক্ষ বিশ্ববিদ্যালয়ও ইন্দোনেশিয়াতে তৈরী হ'য়েছিল। সপ্তম শতাব্দীতে চৈনিক পরিব্রাজকেরা ভারতের পূতভূমিতে পদার্পণের পূর্বে ইন্দোনেশিয়ায় পদার্পণ করে ভারতীয় চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত হয়ে নিতেন। ই-ৎ-সিং-এর কথা জানা যায়, ভারতবর্ষ পরিভ্রমণের পূর্বে তিনি শ্রীবিজয়ে বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা নেন। চতুর্থ শতাব্দীর তারুণ রাজ্যের রাজা পূর্ণবর্মনের লিপি থেকে মনে হয়, ভারতীয়রা সর্বপ্রথম পশ্চিম জাভায় বসবাস করতে শুরু করেন। কিন্তু এ-সত্ত্বেও পশ্চিম জাভার স্থাপত্যের নির্দর্শন আজ দুর্লভ। তার কারণ বোধহয় এখানকার শিল্প ও স্থাপত্য ভঙ্গুর অথবা অস্থায়ী পদার্থে নির্মিত ছিল। ১র্থ-৫ম শতকের আরও লিপি পাওয়া যায়, যেমন জাকার্তা সন্নিহিত অঞ্চলের 'তেগু' লিপি, বোর্নিয়োর রাজা মূলবর্মনের 'কুটেই' লিপি। এ-ভিন্ন আরও তিনটি মূলবর্মনের নামে অভিহিত করা যায়। জাকার্তা মিউজিয়মে রক্ষিত এই লিপিগুলি ভারত ও ইন্দোনেশিয়ার প্রাচীনতম সাংস্কৃতিক যোগাযোগের চিহ্ন। এই লিপিগুলির ভাষা সংস্কৃত এবং অক্ষরমালা দাক্ষিণাত্যের পল্লবগ্রন্থের অনুরূপ।

জাকার্তা মিউজিয়মে প্রস্তর ও ব্রোঞ্জ, রৌপ্য ও স্বর্ণময় সহস্রবৎসরব্যাপী সুপ্রচুর ভাস্কর্যের নিদর্শন রক্ষিত আছে। জাকার্তার পাশেই 'চিবুয়াজা' থেকেই প্রাচীনতম প্রস্তর বিষ্ণুমূর্তি পাওয়া গেছে। এই মূর্তি ৭ম শতকের পল্লব মূর্তির অনুরূপ হলেও খানিকটা আড়ষ্ট ও ভারী। মাদ্রাজের মমল্লপুরীয় উৎকীর্ণ প্রস্তরমূর্তি সদৃশ, দাক্ষিণাত্যের শৈব প্রভাবের নিদর্শন দেখা যায় 'চণ্ডী বাননের' অপূর্ব অগস্ত্য মূর্তিতে। 'জাঙ্গল' লিপিতে জানা যায় যে দাক্ষিণাত্য ও ইন্দোনেশিয়ার সাংস্কৃতিক

বিনিময়ের ফলে 'কুঞ্জর-কুঞ্জ দেশের' অগস্ত্য গোত্রীয় এক ব্রাহ্মণ কর্তৃক একটি মন্দির নির্মাণে অগস্ত্যধর্ম দক্ষিণাবর্তে সীমিত হলেও ইন্দোনেশিয়া খুব জনপ্রিয় ছিল। এই ধর্মমত কুঞ্জর-কুঞ্জ দেশ থেকে আগত বলে বর্ণিত হয়েছে। এই কুঞ্জর-কুঞ্জ দেশের সঙ্গে বর্তমানের কৃষ্ণা-তুঙ্গভদ্রা মধ্যবর্তী অঞ্চল অথবা ত্রিবাঙ্কুর অঞ্চলের অনন্যতা স্বীকার করা যেতে পারে। অগস্ত্য মূর্তিটির ত্বকের সূক্ষ্ম, কমনীয় ও পরস্পর সংযুক্ত রেখাগুলি দৃঢ়পেশীর সজীবতা ও প্রাণস্পন্দিত চেতনার আভাস দেয়। ভারতীয় শিল্পদর্শনের চিন্তাধারায় অনুপ্রাণিত এই ভাস্কর্যটিতে পেশীসঞ্চারের পরিবর্তে কল্পনায় মূর্ত দেহের প্রাণবন্ত উপস্থিতি বর্তমান। তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কমনীয় রেখার স্বাভাবিক অথচ নিয়মিত গতি সুডৌল আয়তনের প্রচণ্ড স্ফীতির আভাস দেয়। 'চণ্ডী বাননে'র আর একটি বিষ্ণুমূর্তিতে শান্ত, গম্ভীর যোগাবস্থার মানসিক ভারসাম্য সমন্বিত প্রতীকীরূপ দেখা যায়। এই দুই মূর্তিকেই অষ্টম শতকের বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। এই শিল্পরীতিতে অসীম সংযম, ঐক্যবদ্ধ সংহতি ও রেখার স্বাভাবিকতা বোধ আসে। এটা ইন্দোনেশীয় ধ্রুপদী শিল্পের বিশেষ একটা দিক যা' ভারতীয় শিল্পেও সহজলভ্য নয়। কিন্তু পূর্ব জাভার শিল্পে এই ধরনের স্বাভাবিক রৈখিক ছন্দ তার প্রাণশক্তিকে যেন হারিয়ে ফেলেছে মূর্তির নিম্নাঙ্গ ক্রমশই অসাড় নিস্পন্দ হ'য়ে উঠেছে।

মধ্য যবদ্বীপে স্থাপত্যের উৎসের সঙ্গে পাল উৎসের মিল ছাড়াও অষ্টম-দশম শতকের অনেকগুলি প্রস্তর ও ধাতুশিল্পের দৃষ্টান্ত থেকে বোঝা যায় যে ইন্দোনেশিয়ার শৈলেন্দ্র রাজবংশের ও বাংলা-বিহারের পাল রাজাদের পারস্পরিক সহযোগিতার সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। শিল্পশাস্ত্রসম্মত মূর্তি গঠনপদ্ধতির কথা ছেড়ে দিলেও বলা চলে যে অনেক ভাস্কর্যের অনাদ্যন্ত সৌন্দর্য, নির্মাণশৈলীর একাত্ম এবং উভয়ের সুকুমার ভাবনার অনন্যতাই প্রকাশ করে। সুরকর্তার নবম শতাব্দীর রৌপ্যলেপিত ব্রোঞ্জ অবলোকিতেশ্বর মূর্তিটির পেশীর নমনীয় বক্রতা ভারতীয়

দৈহিক সজীবতারই প্রতিরূপ এবং মনে হয় মূর্তিটিকে ভাস্কর্যশিল্পের স্বভাবজ নিয়মের মধ্যে ফেলবার চেষ্টা হয়েছে প্রথমেই। পরিপূর্ণ মুখমণ্ডলের ও অধরের সম্পূর্ণতার এবং সুডৌল আয়তনের অনুভূতি রাজশাহী মিউজিয়ামের বগুড়া অঞ্চলে প্রাপ্ত বিষ্ণুমূর্তিটির সুস্পষ্ট পালরীতির কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। নালন্দার একটি অবলোকিতেশ্বরের ব্রোঞ্জ নির্মিত মূর্তির সঙ্গে জাকার্তা মিউজিয়মে রক্ষিত মধ্য জাভার সেমারাং-এর অপূর্ব রৌপ্যনির্মিত মঞ্জুশ্রীর আশ্চর্য মিল আছে। এই দুই ক্ষেত্রেই শিল্পী শুধুমাত্র ভঙ্গিমা অথবা অবয়বের মধ্যে পরিমার্জিত নমনীয় রীতিকেই তুলে ধরতে চান নি। এই মূর্তিটি সৌন্দর্যের এক অবর্ণনীয় প্রকাশে, বিশ্রাম অবস্থার দৈহিক অভিব্যক্তিতে এবং হস্তমুদ্রার আশ্চর্য সংস্থানে সজীব হয়ে উঠেছে। এই দুই ক্ষেত্রেই মুখ ও চিবুক দ্রুত রেখার দ্বারা গঠিত। নালন্দার মূর্তির সজীব তীক্ষ্ণতা ও মঞ্জুশ্রীর উৎফুল্ল ওজস্বিতা অবশ্যই সমপর্যায়ের। পাথরের উপর পেশীগঠনের লক্ষণগুলিকে ফুটিয়ে তুলতে ধাতুর কঠিন ও জড়ীভূত অবস্থার অনুষঙ্গের সঙ্গে পরস্পর সংযুক্ত নমনীয় সুডৌল ত্বকরেখার বৈপরীত্য সৃষ্টি করা হয়েছে এবং নাভিতলের ঈষদ্‌স্ফীত আয়তনের কৌশলটিও অনুষঙ্গ সৃষ্টির সহায়ক হ'য়ে উঠেছে। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রেখার মার্জনা ছাড়াও দেহের কেন্দ্র থেকে খোলাখুলিভাবে খেলোয়াড়োচিত বক্রতার দ্বারা স্থিতিস্থাপকতার অপূর্ব আভাস গড়ে উঠেছে! সুমাত্রার পালেমবাং-এর ব্রোঞ্জ বোধিসত্ত্বের গঠননৈপুণ্যেও নালন্দার ব্রোঞ্জমূর্তির গঠনরীতির অনেক উপাদান বিদ্যমান আছে।

সমগ্র মধ্য ও উত্তর এশিয়ায় এবং সুদূর পূর্বাঞ্চলে বৌদ্ধধর্ম জাগরণের সঙ্গে সঙ্গেই বুদ্ধমূর্তিও ছড়িয়ে পড়ে। জাকার্তা মিউজিয়ামের অতুলনীয় সম্পদ হিসাবে রক্ষিত ইন্দোনেশিয়ার কয়েকটি বুদ্ধমূর্তিকে বলা যেতে পারে এশিয়ার শ্রেষ্ঠ শিল্পকীর্তি। জাকার্তা মিউজিয়ামে রক্ষিত দক্ষিণ-পূর্ব বোর্নিয়োর বিরাট 'কোটা বাংগুন' ব্রোঞ্জ বুদ্ধমূর্তি এমনিই একটি দৃষ্টান্ত। ঈষদ্‌বক্র দক্ষিণ পদ ও দক্ষিণ হস্তের প্রচার

মুদ্রা কর্মযোগের সুস্পষ্ট আভাস দিচ্ছে। এই মূর্তিটি ৪র্থ-৫ম শতকের বলে মনে হয় এবং অমরাবতী ও গুপ্ত-প্রথম যুগের রীতি আশ্রয়ী। স্বচ্ছ বস্ত্র পরিহিত মূর্তিটির গঠন রমণীয়। দক্ষিণ-ভারতের রীতির তীক্ষ্ণ টান, দেহের ক্রমাগত তীক্ষ্ণ রেখার স্বতঃস্ফুর্ত সৌন্দর্য নিতান্তই দুর্লভ! অধুনা জাকার্তা মিউজিয়মে সুদূর সেলিবিস থেকে নিয়ে আসা আর একটি ব্রোঞ্জ বুদ্ধমূর্তির ভগ্নাংশ পাওয়া গেছে। এটা ৪র্থ-৬ষ্ঠ শতকের বলে মনে হয়। অমরাবতীর গঠনপদ্ধতি ও গুপ্তধারার বৈশিষ্ট্যের চিহ্ন সংযুক্ত এই মূর্তিটি অমরাবতীর শেষ যুগ ও গুপ্ত প্রথমযুগের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রতিরূপ, মস্তকের গুরুভার আবরণ বস্ত্রের উঁচু-নীচু ভাঁজ, স্ফীত অঙ্গের সুসঙ্গত ও গমনশীল রেখাগুলির সাবলীল প্রবাহ প্রভৃতি অর্থপূর্ণ লক্ষণ এই ভাস্কর্যটিতে পাওয়া যাবে। বোর্নিয়োর এই শিল্প নিদর্শনের সঙ্গে প্রাচীন আনামের 'ডংডুয়ং'-এর ব্রোঞ্জমূর্তির অনন্যতাবোধ জাগে।

রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখলে সুমাত্রা (প্রাচীন 'মলয়ু' বা শ্রীবিজয়) যবদ্বীপের মতই অনেক শতাব্দী ধরে উল্লেখযোগ্য ছিল। জাকার্তা মিউজিয়ামের প্রাচীনতম শিল্পদ্রব্য সম্ভারের দৃষ্টান্তগুলি সুমাত্রা থেকেই আনীত। প্রথমেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে 'পালেমবাং'-এর দুটি মূর্তি। এর মধ্যে ৬ষ্ঠ-৭ম শতকের পূর্ণাবয়ব একটি বুদ্ধমূর্তি উল্লেখযোগ্য, যদিও এটি সমসাময়িক ভারতীয় মূর্তির মত আধ্যাত্মিক সৌন্দর্যের অধিকারী নয়। চতুষ্কোণী মুখমণ্ডল, বিস্ফারিত চক্ষু, দৈহিক স্থূলতা প্রভৃতির দিক হতে বিচার করলে বলা চলে যে গুপ্তযুগের অজন্তা, 'কানহেরি' পর্বতগাত্র উৎকীর্ণ শিল্পশৈলী ও কম্বোডিয়ার 'প্রি-ক্রাবাস' বুদ্ধের সঙ্গে যথেষ্ট মিল আছে! আর একটি বোধিসত্ত্ব অবলোকিতে-শ্বরের মূর্তি উচ্চতায় আট ফুট। এই বিরাট মূর্তির কমনীয়তা অতিরিক্ত শৈলীসারল্য, আন্তর-সজীবতা, সুউচ্চ জটামুকুট, বিস্তৃত ও ঢালু স্কন্ধদেশ গণ্ডদেশের স্ফীতি এবং স্ফীত বক্ষঃপটের ও নিম্নাঙ্গের ক্রমশ ক্ষীয়মান অভিমুখীনতা প্রভৃতি পল্লব যুগের প্রভাবকেই সূচিত করে। এই মূর্তিটির সঙ্গে সমসাময়িক 'সিতলপুভা'র সিংহলীয় বোধিসত্ত্ব অব-

লোকিতেশ্বরের অসাধারণ সাদৃশ্য উল্লেখযোগ্য। 'মজপাহিত' রাজন্যদের সুমাত্রা অভিযানের পরও সেখানে মূর্তি নির্মাণ শৈলী অক্ষুণ্ণ থাকে। এর দৃষ্টান্ত স্বরূপ ১৪শ শতকের হিন্দুধর্মের ত্রিমূর্তি অর্থাৎ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের ব্রোঞ্জমূর্তির গঠন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

মধ্য যবদ্বীপের পশ্চিমে আগ্নেয়গিরি ঘেরা ছয় হাজার পাঁচশ ফুট উচ্চতায় দিয়েং উপত্যকার মন্দিরগুলি ভারতীয় আদর্শেই নির্মিত। দাক্ষিণাত্যের শৈব মন্দিরগুলির সঙ্গে এদের সম্বন্ধ বিজড়িত। মধ্য জাভার রাজা সঞ্জয়ের সংস্কৃত পল্লবগ্রন্থীয় অক্ষরমালায় লিখিত প্রাচীন-'তম জাঙ্গল শিলালিপি থেকে জানা যায় যে জাভার প্রথম শৈব দেবালয় অগস্ত্য গোত্রীয় ব্রাহ্মণদের দ্বারা নির্মিত। আর এই দেবালয়ের আদর্শ ছিল ভারতের তুঙ্গভদ্রা অববাহিকা স্থিত শৈব মন্দির। এই শৈলীর মন্দিরগুলি ৭ম শতকের শেষ পর্বে তৈরী ও চণ্ডীপুন্টাদেব (যুধিষ্ঠির) ধরনের। পেটিকার মত একটি ঘনক্ষেত্র তাতে খাড়াখাড়িভাবে দণ্ডায়-মান ও সমান্তরাল রেখায় সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত। প্রত্যেকটি মন্দিরেরই একটি গর্ভগৃহ, সামনের দেউড়ি ও তিনদিগের দেওয়াল চতুষ্কোণ স্তম্ভের দ্বারা বিভক্ত। মাঝে মাঝে কুলুঙ্গী ও তার উপরে উৎকীর্ণ কারুকার্য। এই ধারাটি এসেছে ৭ম শতকে লাডখান, আইহোলের চালুক্য মন্দির থেকে। দিয়েং উপত্যকার মন্দিরগুলি যবদ্বীপের প্রাচীনতম মন্দির-গুলির অন্যতম। মনে হয় এই স্থাপত্যকর্মের সামনে কোন বিশেষ আঞ্চলিক আদর্শ ছিল না। যদিও এগুলিতে ভারতীয় ছাপ সুস্পষ্ট। হিন্দু উপবসতির প্রাথমিক যুগে ৬ষ্ঠ শতকের পল্লব রাজা মহেন্দ্রবর্মনের মমল্লপুরীয় সপ্তরথের এবং সমুদ্রতীরের মন্দিরের প্রতিচ্ছায়া এদের মাঝে পাওয়া যায়। ছোট ছোট মন্দিরের সারিযুক্ত সমান্তরাল ভূমিকায় পীরামিড্ আকারের শিখর এই মিলকে আরও সুদৃঢ় করে তোলে। 'চণ্ডী বিম' (চণ্ডীভীম) দিয়েং-এর মন্দিরগুলির মধ্যে স্বকীয় বৈশিষ্ট্য নিয়ে আছে। এই মন্দিরের নীচের দিকটা অবশ্য আরও অন্যান্য মন্দিরের মত একই গঠন কিন্তু শীর্ষদেশের বিচারে এটা উত্তর ভারতের

শিখররীতির অনুরূপ। এর শীর্ষদেশ চৈত্য গবাক্ষবেষ্টিত ক্রমশ বিলীয়-মান ধাপের কোণগুলি খণ্ডিত ভূমি আমলকের মত এবং নিয়মিত দূরত্বে অবস্থিত। কুমারস্বামী এই মন্দিরটিকে ভুবনেশ্বরের পরশুরামেশ্বর মন্দিরের সঙ্গে তুলনা করেছেন। আমি কিন্তু মনে করি দাক্ষিণাত্যের 'হুচ্ছিমল্লীগুড়ি' মন্দিরের (৬ষ্ঠ শতক) শিখরের সঙ্গে এর ঘনিষ্ঠতম সম্পর্ক রয়েছে। বিশেষত মহাবোধির চত্বরে একটি ছোট গুপ্তরীতির মন্দিরের শিখরদেশের সঙ্গেও এর মিল আছে। এই মন্দিরেও একই রকমের চৈত-গবাক্ষ ও ভূমি-আমলক বর্তমান।

অষ্টম শতকের শেষ ভাগে ইন্দোনেশিয়ায় দক্ষিণভারতীয় শৈব প্রভাব ও উত্তরভারতের মহাযান বৌদ্ধ প্রভাব ম্লান হ'তে থাকে। এই মহাযান প্রথা শৈলেন্দ্র রাজাদের আনুকূল্যে প্রচারিত হয়। ঐ সময়ে কলিঙ্গের শৈলোদ্ভব রাজবংশের সম্পর্কিত কোন এক ব্যক্তি মালয় দ্বীপপুঞ্জের কোন এক স্থানে বসতি স্থাপন করেন বলে জানা যায়। পাল যুগের স্থাপত্যশিল্পের চিন্তাধারা কতদূর কার্যকরী হয়েছিল তা পালরাজাদের তৈরী রাজশাহী জেলার পাহাড়পুর মন্দিরের সঙ্গে মধ্য জাভার 'চণ্ডীসেউ' মন্দিরের ভিত্তি-পরিকল্পনা ও উচ্চতার সাদৃশ্য তুলনা করলেই বোধগম্য হবে। দিয়েং-এর বিশেষ ধরনের ঘনক্ষেত্র ও তাব গঠনবৈশিষ্ট্য এখানে প্রয়োগ করা হয় নি। উভয়ক্ষেত্রেই সামনে এক বিরাট বর্গাকার প্রাঙ্গণ। তার চতুর্দিকে মঠের প্রকোষ্ঠ। এই প্রাঙ্গণের মাঝখানে পীরামিড-ধরনের মন্দিরটি অবস্থিত। ভিত্তি-পরিকল্পনা চতুর্ভুজ এবং পূর্ব ভারতীয় শিল্পশাস্ত্রের সর্বতোভদ্র স্থাপত্য-রীতির অনুরূপ। অষ্টম শতকের 'চণ্ডীকলসন' ও নবম শতকের 'চণ্ডীলারাজংরং' চণ্ডীসেউরই গঠনরীতির পরিবর্তিত সংস্করণ। পার্শ্ব-দেউল সম্বলিত চতুর্ভুজ গঠন পরিকল্পনার সুস্পষ্টতা এখানেও পাই। অলিন্দের চতুর্দিকে সমান্তরাল ভাস্কর্য সারি, মন্দিরের গর্ভগৃহের চতুষ্পার্শে চারিটি কক্ষ, ঘোরানো পথ এ-সবই বাংলায় পাহাড়পুর ও মহাস্থান-গড়ের মন্দিরের বৈশিষ্ট্য। প্রাচীন ব্রহ্মদেশের স্তূপগুলি, বিশেষ করে

পাগানের গুরুভার অথচ সুন্দর 'আনন্দ' মন্দির বাংলার পালরীতির স্বাক্ষর বহন ক'রছে। 'চণ্ডীসেউ'-এর সমগ্র ক্ষেত্রফল ১৮৫ × ১৬৫ মিটার। এরই মাঝখানে অর্ধসমাপ্ত মন্দিরটিকে ঘিরে দুই সারিতে ২৪০টি ছোট ছোট মন্দির আছে। সম্প্রতি আবিষ্কৃত শিলালিপিতে পাওয়া যায় ৭৮২ খৃঃ শতকে গৌড়কুলগুরু 'কুমারঘোষ' এই মন্দিরে মঞ্জুশ্রী মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন।

দূর থেকে দেখা বিশ্ববিখ্যাত বোরোবুদুর প্রস্ফুটিত উৎপলের মত। সাম্প্রতিক গবেষণায় এর জটিল স্থাপত্যের রহস্য উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। এটা স্তূপ বা মন্দির নয়। ফরাসী পণ্ডিত 'পল মাস' দেখিয়েছেন যে বোরোবুদুরের বিভিন্ন স্তরের ভাস্কর্য বৌদ্ধধর্মের মহাজাগতিক চিন্তাধারাকে প্রতীকীরূপে প্রকাশ করেছে। মাটির তলার ভিত্তি স্থানটিই হল 'কামধাতু' অথবা তামসিক কামনার জগৎ। খোদাইকরা আকাশোন্মুখ উচ্চধাপগুলিই হল 'রূপধাতু' বা সতত দৃশ্যমান জগৎ, আর উপরের তিনটি বৃত্তাকার স্তর ও ৭২টি অর্ধপ্রকাশিত বুদ্ধমূর্তি সম্বলিত স্তূপই 'অরূপধাতু' বা অদৃশ্য অপার্থিব জগৎ। ভাস্কর্যমণ্ডিত অলিন্দ এবং সারি সারি ক্ষুদ্র স্তূপমালা সজ্জিত এই স্থাপত্যরীতির সঙ্গে পালরীতির সম্পর্ক আছে। এর প্রায় সমচতুষ্কোণী ভিত্তি-কল্পনা পাহাড়পুর রীতি-বর্ধিত একরূপ। বোরোবুদুরের মণ্ডল পরিক্রমায় তীর্থযাত্রীরা বৌদ্ধ ভাবনাকে সম্যক্‌রূপে লাভ করত। আকাশপথ থেকে দেখলে, নেপাল ও তিব্বতের চিত্রার্পিত মণ্ডলগুলির বিশেষ মিল দেখা যায়। আবার এর নয়টি স্তর মহামেরুর নয়টি স্তরের প্রতীক্‌স্বরূপ। এই কারুকার্য-মণ্ডিত মণ্ডলের মধ্য দিয়ে যখন কোনও বৌদ্ধ ভিক্ষু ধীরে ধীরে অগ্রসর হতেন তখন তিনি হয়ত উপলব্ধি করতেন যেন এই পথেই গৌতমবুদ্ধ ও সামন্তভদ্র প্রভৃতি বোধিসত্ত্বগণ জীবনের বিভিন্ন জ্ঞান রাজ্যে প্রস্থান করেছেন। চতুর্দিকের প্রাচীরে বেষ্টিত সিঁড়ির স্তরে স্তরে যাত্রীরা মন্দিরের শিখরে আরোহণ করতেন, শীর্ষদেশের স্তূপিকামণ্ডিত সর্বোচ্চ স্তরে সমস্ত পটভূমিকার পরিবর্তন লক্ষিত হত। ভাস্কর্য ও খচিত প্রকার

বেষ্টনী এখানে অনুপস্থিত। শুধুমাত্র মানবাত্মার সম্পূর্ণ মুক্তি ও চারিদিকে উন্মুক্ত আকাশ-পৃথিবী।

বোরোবুদুরের অগণিত গুরুভার বিরাট ধ্যানীবুদ্ধ যদিও সারনাথের গুপ্তরীতির শিল্পকলাকেই প্রকাশ করে তবুও বিমূর্ত শিল্প-চেতনার দিক থেকে এরা অনন্য শিল্পসম্পদ। ভারতীয় মূর্তি-কল্পনার কৌশলটির মধ্যে বিপরীতধর্মী চেতনার এক বৈষম্য সৃষ্টি করা হয়েছে। উপবিষ্ট বুদ্ধ কিম্বা দণ্ডায়মান বিষ্ণুমূর্তির সাবলীল রেখার টান ও ঘনতা অনায়াসে ভারবোধ ক্ষমতা, অপার্থিব নিশ্চলতার স্বরূপ বিশ্বশক্তির আধার এক বিরাট স্তম্ভের মত প্রতীয়মান।

সুরকর্তার মিউজিয়মে রক্ষিত একটি অপূর্ব ব্রোঞ্জ বুদ্ধমূর্তি মধ্য জাভার ধ্রুপদী চেতনাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। কিন্তু অপর পক্ষে বোরো-বুদুরের প্রাকার বেষ্টনীর কারুকার্যগুলি এক নূতন ভাবনার ইঙ্গিত দেয়। এগুলোতে পাওয়া যায় অজন্তার শিল্পের সূক্ষ্মতা ও ত্রস্ততার পারস্পরিক সম্পর্ক। অজন্তার গুপ্ত চালুক্য বুদ্ধমূর্তির পরিকল্পনা কৌশলের প্রভাব ও নালন্দার কতকগুলি পালযুগের বুদ্ধমূর্তির প্রভাব জাভার কতকগুলি ব্রোঞ্জমূর্তির উপরও সুস্পষ্ট। এ-সবই শৈলেন্দ্র রাজবংশের কীর্তি। যোগযাকর্তা, জাকার্তা ও সুরকর্তা মিউজিয়মে এগুলি অধুনা রক্ষিত আছে।

'চণ্ডীমেণ্ডুত' তৈরি হয়েছিল ৮ম শতকে বোরোবুদুরের কিছু আগে। ইন্দোনেশিয়ার শ্রেষ্ঠ বৌদ্ধ কীর্তিগুলির মধ্যে এটি মন্দির-স্থাপত্য ও মূর্তি-ভাস্কর্যের দিক থেকে অন্যতম বলে পরিগণিত হয়। উত্তর-পশ্চিম-মুখী এই মন্দিরটি ভারতবর্ষের দিকে প্রসারিত। অন্যান্য সব মন্দির পূর্ব-মুখী। অন্তবর্তীকক্ষে বৌদ্ধ ত্রিমূর্তির মধ্যে ধর্মচক্র-মুদ্রার সংস্থিত প্রলম্বপাদাসনা উপবিষ্ট বুদ্ধ এবং এর দু'পাশে অবস্থিত পদ্মপাণি ও বজ্রপাণি অনন্যসুন্দর ও চিত্তাকর্ষক। মধ্যস্থলের ১৮ ফুট উঁচু সুবিশাল বুদ্ধমূর্তিটি মাত্র একটি প্রস্তরখণ্ড থেকে খোদিত। মূর্তিটির অনৈস্বর্গিক বিরাটত্বকে রূপায়িত করেছে অপূর্বভাবে। পদ্মপাণির শান্ত, মধুর ও

অসাধারণ রূপটি মনকে আকর্ষণ করে। বৌদ্ধধর্ম প্লাবিত আর কোন দেশের বুদ্ধমূর্তি শ্রেণীর মধ্যে যেন এ মূর্তি আর নেই। দেশী-বিদেশী প্রত্যেক যাত্রীকেই নিস্তব্ধ হয়ে যেতে হয় 'চণ্ডীমেণ্ডুতের' এই ধ্যানমগ্ন মূর্তির সামনে উর্ধ্ব জগতের সংস্পর্শে।

প্রাম্বানালের সমতলভূমির মন্দিরগুলির মধ্যে 'চণ্ডীকলসন' যোগযাকর্তা ও প্রাম্বানালের মধ্যে অবস্থিত। স্থাপত্যের দিক থেকে এটিও অমূল্য। ৭৭৮ খৃঃ অঃ এর এক শিলালিপি থেকে জানা যায়, এই মন্দিরটি বৌদ্ধদেবী 'তারার' উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত। মন্দির গাত্রের সুকুমার প্রসাধন, বিশেষ করে মন্দিরগাত্র-সন্নিবিষ্ট চতুষ্কোণ অর্ধস্তম্ভ ও ক্ষুদ্রাকৃতি 'প্রাসাদ', বহু 'কালমবার', কুলুঙ্গীর মধ্যস্থলে পাথরের উপর ফুলপাতা নক্শাকাটা কারুকার্য, মনোহারী ও অপরূপ। আর একটি বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠান 'চণ্ডীপ্লাওসান' স্থাপত্যশিল্পের এক বিশিষ্ট অবদান। এর বেশির ভাগ এখন ধ্বংসস্তূপে পরিণত। এর অন্যতম প্রধান মন্দিরটিকে অধুনা নূতনরূপে পুনর্গঠিত করার কাজ চলেছে। এর চারপাশে ৫৮টি ছোট মন্দির ও ৫৮টি স্তূপ বর্তমান। শৈলেন্দ্র রাজবংশীয় বৌদ্ধধর্মাবলম্বী কোন এক রাজপুত্রী এই স্থাপত্যকর্মের প্রতিষ্ঠাত্রী। তিনি মতরাম রাজবংশের কোন রাজাকে বিবাহ করেছিলেন। দুই-জনের সম্মিলিত প্রচেষ্টাতেই এই মন্দিরের সৃষ্টি হয় ৯ম শতাব্দীতে।

ইন্দোনেশিয়ার অসংখ্য বৌদ্ধস্থাপত্যের মাঝে যোগযাকর্তার ন' মাইল উত্তর-পূর্বে 'লারাজংরং'-এর হিন্দু মন্দির শ্রেণী ইন্দোনেশিয়ার বৃহত্তম মন্দিরসমষ্টি। সম্ভবত মধ্য জাভার প্রথম শৈব রাজা বলিতুঙ্গ নবম শতকের শেষভাগে নির্মাণ কয়েছিলেন। বোধহয় বোরোবদুরের বৌদ্ধ প্রতীকীচিন্তার প্রতিক্রিয়াজাত পরিকল্পনা এখানের হিন্দু স্থাপত্যরীতিতে বর্তমান। এই জটিল স্থাপত্যের মধ্যস্থলে রয়েছে ১৯৭ ফুট উঁচু বিরাট শিব মন্দির এবং তৎসংলগ্ন ব্রহ্ম ও বিষ্ণু মন্দির এবং এই মন্দিরগুলির চতুস্পার্শস্থ দেওয়ালের চারিটি প্রবেশদ্বার। বোরো-বুদুরের মতই অন্দরে ধাপে ধাপে উন্নীত মঞ্চগুলি কারুকার্যে বিভূষিত।

এখানে বৌদ্ধধর্মের ললিতবিস্তার ও গণ্ডব্যূহের পরিবর্তে উৎকীর্ণ রয়েছে রামায়ণ ও কৃষ্ণায়ণ বিষয়ী অসংখ্য চিত্র। মহাকাব্যিক বিশ্লেষণের প্রয়োজনে বৌদ্ধ শান্ত সমাহিত পরিস্থিতির পরিবর্তে গতিশীলতা ও কর্মদ্যোতনা এসেছে। মধ্যকক্ষের ১২ ফুট উচ্চ বিশাল শিবমূর্তিটি দেব-রাজধর্মমত দ্বারা প্রভাবিত বলেই মনে হয়। এই মূর্তিটি সম্বন্ধে বলা হয় যে এটি ঈশ্বর আরোপিত রাজা বলিতুঙ্গের প্রতিকৃতি। এই মূর্তির ভিত্তিভূমিতে একটি ফাঁপা সুড়ঙ্গে পূত দেহাবশেষ, স্বর্ণ-রৌপ্য-পত্রাদি পাওয়া গেছে।

এইবার মধ্যজাভা ও পূর্বজাভার মন্দিরগুলির তুলনা করা যেতে পারে। মধ্য জাভার মন্দিরগুলির প্রাথমিক গঠনটি লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে এর প্রত্যেকটি অংশই সুসংস্থিত। শিল্পশাস্ত্র ও বাস্তুশাস্ত্র সম্মত ভারতীয় মন্দিরগুলির প্রাথমিক গঠনটি লক্ষ্য করলেও গঠনরীতির ঐক্যতা বোধগম্য হবে। প্রাম্বানামের মন্দিরগুলির মত এখানকার মন্দিরগুলির ভিত্তি রামায়ণ মহাভারতের কাহিনীকে অবলম্বন করেই তৈরি হয়। কিন্তু 'পানাতারাণের' মন্দির সুশৃঙ্খল কোন রীতির আশ্রয়ে নির্মিত হয়নি। এই মন্দিরে কেন্দ্রানুগ পরিকল্পনার অভাব দেখা যায়। মন্দির সংস্থার জটিল পর্যায় বিভাগ প্রথম দর্শনে আরও একটি মণ্ডলরূপে প্রতীয়মান হয়। এর পশ্চাতে ঐ মন্দিরের ভিতরে অনুষ্ঠিত ক্রিয়াকলাপের প্রয়োজন বিদ্যমান।

সংস্থান ও সংগঠনের বিচারে এখানকার স্বতন্ত্র ঘরগুলিতেও বলিদ্বীপের মন্দিরের প্রভাব লক্ষণীয়। এই প্রভাবের সূত্রপাত বলি এবং পূর্ব যবদ্বীপের ক্রমাগত ঘনিষ্ঠতার মধ্যে। মধ্য যবদ্বীপের ধর্ম প্রতিষ্ঠানগুলির স্থাপত্য তার শীর্ষদেশকে কেন্দ্র করে, দেবমূর্তির স্থান তারই নিম্নে অথবা সমস্ত পরিকল্পিত ক্ষেত্রের জ্যামিতিক কেন্দ্রে। পানাতারান আর বলির 'পুর'-গুলিতে মূর্তির সন্নিবেশ ঘটেছে মন্দিরের শেষ কোণে যার পাশেই পাহাড় মাথা তুলেছে—পর্বত শিখর হতে দেবতাদের অবরোহণের প্রাচীন কিংবদন্তীর স্মৃতি নিয়ে। কিন্তু মধ্য-

জাভার চিন্তাধারা স্বতন্ত্র। সেখানে এই বিপুল বিশ্বের খণ্ডাংশ পাহাড়ের বিশালতাকে মন্দিরের বিশালতার মধ্যে রূপায়িত করার চেষ্টা হয়েছে। মধ্য ও পূর্ব জাভার কারুকার্য কতকগুলি মৌলিক পার্থক্যে বিচ্ছিন্ন। মধ্য জাভার কারুকার্য, পূর্ব জাভার কারুকার্য অপেক্ষা অনেক বেশী বাস্তব চেতনামণ্ডিত। চণ্ডী পানাতারানের এমনই একটি উৎকীর্ণ চিত্রে 'ওয়াং' মঞ্চে অভিনীতমূর্তির আভাস সুস্পষ্ট। ইন্দোনেশীয়দের দেশজ কল্পনার নিজস্বতা এখানে প্রকাশিত। ঐ চিত্রাবলীর দ্বি-মাত্রিক বিকৃত-মূর্তির শিরস্ত্রাণ ও বিশৃঙ্খল পটভূমিকা এক রহস্য পরিবেশ সৃষ্টিকারী। পূর্ব জাভার কয়েকটি বিশালকায় প্রস্তর মূর্তি শেষ পর্যন্ত ভারতীয় ভাব বহন করে এনেছে। সিংহসারির দ্বারপাল ভৈরব এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

গুণুং আগুং গিরি শুধুমাত্র সুদৃশ্য বলে নয় বলির ধর্মজীবনের মধ্যে তার প্রভাবের জন্যও বিশেষিত। কথিত আছে কৈলাসের মত এখানেও শিব-পার্বতীর অধিষ্ঠান। ১০ম শতকে এখানে বৈশাখী বা 'বাসুকী' মন্দির স্থাপিত হয়েছিল। মহারাজ এরলঙ্গের পিতা রাজা উদয়ন প্রতিষ্ঠিত এই মন্দিরের দ্বারদেশে অদ্ভুদাকৃতি দ্বারপাল ও সিংহের মূর্তি রাখা হয়েছে। বলির মন্দির মাত্রেই জমকালো অলঙ্কার খচিত গাত্রদেশ, অপ্সরা, পশুপক্ষী ও দেবমূর্তির সমারোহে স্বর্গীয় পর্বতেরই প্রতীকীরূপ। ভাস্কর্য সুষমামণ্ডিত দ্বিধাবিভক্ত মন্দির দ্বার সুমেরু ও গুণুং আগুং পর্বতেরই পরিবর্তিত প্রতীকীরূপ। বলি মিউজিয়ামের শিল্প ও পুরাবস্তুর মধ্যে সবচেয়ে কৌতূহলজনক হল মৃত্তিকানির্মিত এক সারি পোড়ামাটির স্তূপিকা ও ফলক। সেগুলি হুবহু নালন্দা ও বুদ্ধগয়ার প্রতিরূপ। এছাড়াও কয়েকটি বৌদ্ধ ব্রোঞ্চ মূর্তি যথা, নবম—দশম শতকের গিল্টির কাজকরা দণ্ডায়মান বুদ্ধ, দাক্ষিণাত্যের অমরাবতী শেষ যুগের বৌদ্ধ ভাস্কর্যের দ্বারা প্রভাবান্বিত। অন্যদিকে কুবের, তারা এবং অবলোকিতেশ্বরের মূর্তিতে পূর্ব ভারতীয় প্রভাব দেখা যায়। সম্প্রতি আবিষ্কৃত বলির বেড়ুলুর কাছে 'গোয়াগজ' বা 'গুহাগজ' প্রত্নতত্ত্বের দিক থেকে বিশেষ মূল্যবান। এই গুহার সামনে

নীচু স্তরে ১১ শতকের একটি স্নানাগারের ভগ্নাবশেষ পওয়া গিয়েছে। 'T' আকারের গুহার বর্হিভাগে বিস্তৃত পিশাচমস্তক আর গণেশ পার্বতী ও শিবলিঙ্গ মূর্তি ভিতরে অবস্থিত। ১১ শতকের এই স্নানাগারে সারি সারি বিদ্যাধরী মূর্তি সাজানো। তাদের হস্তকুম্ভের উচ্ছৃক্ত জলধারা রামধনুর মত ঈষৎ বক্রতায় নীচে নেমে আসে। সারি সারি ক্ষুদ্র স্তূপ আর উদ্ধত তরবারি শ্রেণী দেখলে মনে হয় এই স্থানই বৌদ্ধ ও শিব ধর্মের যথার্থ মিলনস্থল। শিব-বুদ্ধ ধর্মমত পূর্ব জাভা এবং বলির সংস্কৃতির এক বিশেষ লক্ষণ। 'যঃ শিব সঃ বুদ্ধ' তাদের এই চিন্তাধারা। জাভার বিজয়ী বীর মহারাজ ক্রেতনগর পরবর্তীকালে 'শিববুদ্ধ' রূপে পরিচিত হন। তাঁর দ্বৈত মূর্তি পূর্ব জাভার 'সিঙ্গসারী' মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হয়। এদেশীয় তত্ত্ব চিন্তায় বুদ্ধ, শিবের কনিষ্ঠ ভ্রাতারূপে সমাদৃত হয়েছেন। মধ্যযুগে বাংলা দেশে তান্ত্রিক সমন্বয়ের ফলে শিববুদ্ধের কল্পনা আগেই সৃষ্টি হয়েছিল। একথা এতদিন ইন্দোনেশিয়ায় অবিদিত ছিল। ইন্দোনেশীয়গণ এটাকে সম্পুর্ণ নিজস্ব বলে মনে করতেন। ১১ শতকের একটি ব্রোঞ্জ শিববুদ্ধ মূর্তি বরিশাল থেকে প্রাপ্ত হবার পর বর্তমানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ মিউজিয়মে রক্ষিত আছে। অপূর্ব শ্রীমণ্ডিত উর্ধ্বলিঙ্গ এই শিবমূর্তির মস্তকে ধ্যানীবুদ্ধ সমাসীন। এই অভাবনীয় মূর্তিটিই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার একটি আধুনিক ও পুরাতন বিশিষ্ট ধর্মমতের উৎস সন্ধানে সঠিক নির্দেশ দেয়।

বলিতে থাকাকালীন কারাঙ আসেমের রাজার নিমন্ত্রণে সেখানে অনুষ্ঠিত 'রুষি যজ্ঞ' বা 'ঋষি যজ্ঞ' দেখতে গিয়েছিলাম। দুই শত বৎসর পরে অনুষ্ঠিত এই যজ্ঞে বর্তমান বলির আচার-আচরণের বিশেষ রূপটি ধরা পড়ে। বলির রাজধানী ডেনপাসার থেকে মোটর পথে ৭০ মাইল গেলে দূরে 'কারাঙ আসেম' ১৮ শতকের ক্লুথ কুঙ-এর রাজার প্রাসাদ ও কাষ্ঠনির্মিত প্রাঙ্গণ মধ্যপথে দ্রষ্টব্য। রামায়ণ মহাভারতের কাহিনী উজ্জ্বল রঙে চিত্রিত তার অভ্যন্তরে। কারাঙ আসেমে যজ্ঞভূমিতে গিয়ে দেখা গেল সুউচ্চ বেদীর উপর ১৫০ জন শৈব ও বৌদ্ধ পুরোহিত একত্রে

প্রাচীন সংস্কৃত মন্ত্র পাঠ করছেন। সেখানকার ধর্ম-প্রিয় রাজার পরামর্শে খোদিত পার্থসারথির একটি বিশাল মূর্তি দেখে আমি আরও রোমাঞ্চিত হলাম। তিন হাজার মাইল দূরে প্রায় প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে হিন্দু সংস্কৃতি ও সভ্যতার আলোক আমায় করেছিল অভিভূত। পদ্মবেদীর দিকে অগ্রসরমান শোভাযাত্রায় প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষের ঠিক পশ্চাতেই বলির শাসনকর্তার ও অন্যান্য মাননীয় ব্যক্তিদের পুরোভাগে আমার স্থান নির্দিষ্ট হয়েছিল। সমবেত জনমণ্ডলী নমস্কার করে অভিবাদন জানালেন, 'ভারতবর্ষ থেকে গুরু এসেছেন।'

যাদুঘর ও তার বৈশিষ্ট্য

সচরাচর মানুষ যা দেখতে পায় না সে সম্বন্ধে ধারণা করবার ক্ষমতা খুব বেশী থাকে না ; সেইজন্যই নূতন কিছু দেখলেই মানুষ বিস্ময় অনুভব করে। কিন্তু এই পৃথিবীতে শুধু নূতন নয়, অদ্ভুত জিনিষের সমাবেশও কিছু কম নেই এবং যা' কিছু জগতে বর্তমান সব কিছুরই আবির্ভাব ও বিকাশ সম্বন্ধে যথেষ্ট চিন্তা ও অনুশীলন না করলে সুস্পষ্ট বুঝতে পারা যায় না। বহুদিন থেকেই পৃথিবীর নানা জায়গায় বিস্ময়-কর ও প্রাচীন দ্রব্য সংগ্রহের ঝোঁক মানুষের মধ্যে বর্তমান রয়েছে। রোমক সভ্যতার উন্নতির যুগে রোমের সম্রাট ও বিশিষ্ট নাগরিকদের মধ্যে প্রাচীন গ্রীক শিল্পদ্রব্য বিষয়ে, বিশেষ করে ভাস্কর্য নিদর্শন সংগ্রহ করবার একটা প্রেরণা দেখা দিয়েছিল। অবশ্য উদ্যান ও গৃহসজ্জার উপকরণরূপে ছাড়া এই ধরনের আগ্রহের অন্য কোনরূপ সার্থকতা সেই যুগে দেখা দেয়নি। খৃস্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে রেনেসাঁর যুগে আবার প্রাচীন শিল্প সংগ্রহের ঝোঁক প্রথমে ইটালীতে এবং সেখান থেকে সারা ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে। এই যুগ থেকে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসাও মানুষের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে এবং নৈসর্গিক ঘটনাবলী সম্বন্ধেও মানুষের মনে জিজ্ঞাসা দেখা দেয়। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে খৃস্টীয় মঠে সন্ন্যাসীরা এবং কোন কোন অর্থশালী ভূম্যধিকারীরাও ইউরোপ জুড়ে নানা বিচিত্র ধরনের জিনিষ সংগ্রহ করতে এবং সেই সব জিনিষ সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য সমস্ত তথ্য লিপিবদ্ধ করে রাখবার কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। এমনি করে বিচিত্র এবং অদ্ভুত জিনিষের সংগ্রহ করবার অনুপ্রেরণার ভিতর দিয়ে জ্ঞানের সঙ্কলন ও বিস্তারের ব্যবস্থা হয়েছিল। আধুনিক সংগ্রহশালাগুলির প্রতিষ্ঠার মূলে ঐ ধরনের অনুপ্রেরণাই কাজ করে থাকলেও আরম্ভে এই প্রতিষ্ঠানগুলি জনসমাজে এমনকি অভিজ্ঞ এবং খ্যাতনামা রসিকদের কাছ থেকেও সমর্থন বা সহানুভূতি পায়নি।

আধুনিক জগতের সংগ্রহশালার মধ্যে British Museum অন্যতম প্রাচীন ও বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান। কিন্তু এই প্রতিষ্ঠানটি গড়ে উঠবার পেছনে সমাজের শিক্ষাদীক্ষায় অগ্রণী ব্যক্তিদের সচেতন কোনও প্রয়াস ছিল না। নিতান্ত আকস্মিক ভাবেই উৎসুক পর্যটক এবং সংগ্রাহকদের সংগৃহীত দ্রব্য-সামগ্রী নিয়েই এই বৃহৎ সংগ্রহশালার পত্তন হয়।

প্রথমে এই সংগ্রহশালা সম্বন্ধে জনসাধারণের মনে খুব ভাল ধারণা ছিল না। সম্ভবত এটিকে একজন অলস মানুষের অবসর-বিনোদনের স্থানরূপেই দেখা হত। বিখ্যাত রাজনৈতিক উইলিয়ম কবেট্ একসময়ে তাই বলেছিলেন 'Of what use in the wide world is the British Museum? Let those who lounge in it and make it a place of amusement contribute to its support'. এমনকি Encyclopaedia Britannica-তেও তখন মিউজিয়ম সম্বন্ধে কোনও নিবন্ধ ছিল না। এ থেকেই মিউজিয়ম সম্বন্ধে প্রচলিত ভাবধারা কি ছিল তা বুঝতে পারা যায়। ধীরে ধীরে অবশ্য মিউজিয়ম সম্বন্ধে ধারণার পরিবর্তন দেখা যায়। কিন্তু স্বনাম-খ্যাত ডাঃ জনসনের নিকটেও মিউজিয়মগুলি 'repository of learned curiosities'-এর অতিরিক্ত আর কিছু ছিল না।

কিন্তু এর পরেই স্বল্পতম সময়ের মধ্যেই যাদুঘরের উদ্দেশ্য ও সংস্কৃতি জগতে যাদুঘরের উপকারিতা সম্বন্ধে ধারণার মৌলিক পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। আজকের জগতে শিক্ষায় ও সংস্কৃতিতে অগ্রণী সমাজে যাদুঘর তার অনিবার্য মর্যাদা নিয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। যাদুঘর আর 'repository of learned curiosities' নয়, Huxley-র ভাষায় তা আজ 'consultative library of objects' রূপে জ্ঞানবিস্তার কেন্দ্র হয়ে উঠেছে বিশেষত ইউরোপ ও আমেরিকায়। শিক্ষা ও জ্ঞান প্রসারকল্পে মিউজিয়মের স্থান আজকে বিশ্ববিদ্যালয় এবং সংবাদপত্রের মতই সুপ্রতিষ্ঠিত ও সমাদৃত এই দুই মহাদেশে।

দুর্ভাগ্যক্রমে মিউজিয়মগুলি আমাদের দেশে এখন পর্যন্ত শাসক বা জনসাধারণ কারো কাছেই উপযুক্ত মর্যাদা লাভ করতে সক্ষম হয়নি। যাদুঘরের সংখ্যাও আমাদের দেশে নিতান্ত কম। পাশ্চাত্য জগতের ক্ষুদ্রতম সহরে, এমনকি গ্রামগুলিতেও মিউজিয়ম প্রতিষ্ঠা হচ্ছে। কিন্তু আমাদের দেশে উল্লেখযোগ্য ধরনের সংগ্রহশালা প্রাদেশিক রাজধানী-গুলিতেই কেন্দ্রীভূত। যাদুঘরগুলিতে যে ধরনের ঔৎসুক্য পরিতৃপ্ত হয় অনুরূপ প্রয়োজনে প্রাচীন যুগে মন্দিরাদিতে নানাধরনের ভাস্কর্য এবং চিত্রকলার সমাবেশ করা হত। আমাদের মনোবৃত্তির বিশেষ পরিবর্তন বোধহয় হয়নি ; সেইজন্যই আধুনিক সংগ্রহশালার মধ্যেও চিত্র ও ভাস্কর্য সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠানগুলির প্রাধান্য দেখা যায়। তবে পুরাতত্ত্ব সম্পর্কিত সংগ্রহশালা ছাড়া বিজ্ঞানের নানা বিষয় নিয়ে গড়ে উঠা সংগ্রহও এদেশে একাধিক রয়েছে। কোন কোন সংগ্রহশালা এই দিক দিয়ে পাশ্চাত্য দেশের কোন কোন প্রথমশ্রেণীর যাদুঘরের সমকক্ষ বললে অন্যায় হবে না।

এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে আমাদের দেশে যেপর্যন্ত না শিক্ষার আক্ষরিক দিকের সঙ্গে দৃষ্টিগ্রাহ্য বা visual দিকটাও উল্লেখ-যোগ্য মর্যাদা লাভ করছে সেপর্যন্ত যেমন সাধারণের মধ্যে শিক্ষা সুলভ হয়ে উঠবে না তেমনি মিউজিয়ম সমূহেরও প্রকৃত প্রতিষ্ঠা ঘটবে না। সহজতম উপায়ে কোন বিষয়ে মোটামুটি জ্ঞান সাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য পুঁথি-পত্রের চেয়েও সেই সম্পর্কিত দ্রব্যসামগ্রী চোখে দেখায় যে অধিকতর সাহায্য হয়, বহু গবেষণার ফলে এ সত্য আজ প্রতিষ্ঠালাভ করেছে। প্রাচীন ভারতে এই সত্য যে অভিলব্ধ ছিল, মন্দিরগাত্রে ও প্রাচীরে নানা শিক্ষামূলক চিত্রের সমাবেশ থেকে তা' স্পষ্টই বুঝতে পারা যায়। মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে যে 'নয়া তালিমী' শিক্ষাব্যবস্থার পরিকল্পনা রচিত হয়েছিল তাতেও লোকশিক্ষার এই দৃষ্টি-গ্রাহ্য রূপটির সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতনতার পরিচয় পাওয়া যায়। এই শিক্ষা-ব্যবস্থায় নানা বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞানবিস্তারের সুযোগ রাখা হয়েছে।

বর্তমান মানুষের জীবন বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ এবং জীবনচেতনা ও জ্ঞানের বিচরণক্ষেত্র। এই বৈচিত্র্য ও জটিলতার প্রসার বহুবিস্তৃত। সেইজন্যই যাদুঘরগুলিকে আধুনিক জ্ঞানবিস্তারের বিশিষ্টতম ক্ষেত্র বলে অভিহিত করা যেতে পারে। এখানে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সজ্জিত গৃহে সুলিখিত পরিচয়লিপি ইত্যাদির সহায়তায় স্বল্পতম সময়ে মানুষকে যে পরিমাণ বিষয় সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল করে তোলা যায়, পুঁথির মারফৎ তা' কখনই হওয়া সম্ভবপর নয়। এই জন্যই যাদুঘরকে বিশিষ্ট মর্যাদায় মানুষের শিক্ষাকেন্দ্ররূপে প্রতিষ্ঠিত করা প্রয়োজন। যাদুঘরগুলি এই-রূপে যদি জ্ঞানবিস্তারের কেন্দ্ররূপে ও সুন্দরের মন্দির হিসাবে গড়ে ওঠে তবেই যাদুঘরগুলির পূর্ণ প্রতিষ্ঠা লাভ হবে। এইখানেই হবে যাদুঘরের পরম পরিণতি ও সার্থকতা।

পুরাতত্ত্ব চর্চা ও শিল্পরসগ্রাহীতা বাঙালী সমাজে ব্যক্তিবিশেষের চিত্তবিনোদন ও অবসর যাপনের উপায় স্বরূপই মোটামুটি গ্রহণ করে আসা হচ্ছে। এই সংকীর্ণ গণ্ডীর বাইরেও পুরাতত্ত্বচর্চা এবং বিশেষ করে শিল্পরসগ্রাহীতার যে একটা বিশেষ স্থান আছে, এদের প্রয়োজনীয়তার ক্ষেত্র যে এই গণ্ডীর বাইরেও বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত একথা স্বীকার করবার সময় আজ এসেছে ; বিশেষ করে এসেছে এই জন্যে যে বৃহত্তর উদ্দেশ্য ও বিস্তৃততর দৃষ্টি নিয়ে জাতীয় জীবনকে পুনর্গঠন করবার কথা আজ ব্যাপকভাবে আমাদের চিন্তাক্ষেত্রকে আকৃষ্ট করেছে। জাতীয় জীবনের এই উল্লেখযোগ্য সময়টিতে তথাকথিত আধুনিকতার অধিষ্ঠানক্ষেত্র মহানগরী থেকে দূরে থেকেও আপনারা শিল্প-সামগ্রী সংগ্রহকার্যে যে উৎসাহ দেখাচ্ছেন তাতে আপনাদের সহৃদয়তাপূর্ণ আমন্ত্রণ উপেক্ষা করতে পারলাম না।

বর্তমানে আমাদের সংস্কৃতি যে রূপ গ্রহণ করেছে তার মূল্য নির্ণয় করা সহজ না হলেও এর যে কয়টি বৈশিষ্ট্য সহজেই চোখে পড়েছে তার মধ্যে নগরকেন্দ্রিকতা অন্যতম। সমাজের তথাকথিত সঞ্জীবতা গ্রামগুলিকে পরিত্যাগ করে নগরকে আশ্রয় করেছে, তার কৃত্রিম

আমোদ-প্রমোদ, অহেতুক বিলাসব্যসন, ব্যাপ্তিহীন গতি ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে। অতীতেও আমাদের প্রদেশ বহু নগরীতে সমৃদ্ধ ছিল কিন্তু সমাজ ও সংস্কৃতি বর্তমানের মত নগরকেন্দ্রিক ছিল না। গ্রামগুলিকে শোষণ করে বর্তমানের মত নগরী স্ফীত হয়নি তাই গ্রাম ও গ্রামের জীবনকে কেন্দ্র করে একটা জনসংস্কৃতি তার হাসিকান্না, উৎসব, উৎসাহ নিয়ে বেশ স্থিত হয়ে বসেছিল। এই সংস্কৃতির অন্যতম উপজীব্য ছিল একটা বিশিষ্ট শিল্পসাধনা। এই সাধনা রূপ পেয়েছিল মাটির পুতুলে, পোড়ামাটির ফলকে, অলঙ্কৃত মন্দির চৈত্যে, পাথরের বিশেষ করে নিকষ কালো কষ্টিপাথরের গড়া নিখুঁত কাজের অসংখ্য মূর্তিতে, অষ্টধাতুর ঢালাই করা প্রতিমায়, পুঁথি ও পাটার মণ্ডন চিত্রে। এ ছাড়া নিত্যকার জীবনযাত্রার সঙ্গে শিকে, কাঁথা, চিত্রিত সরা আর সাদা আলপনার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগে, একটা জীবনমধুর রূপবোধ সমস্ত মাটির অস্থি-মজ্জার সঙ্গে জড়িত হয়ে গিয়েছিল।

জাতীয় জীবনের এক অধঃপতিত অবস্থায় এসে আজ এই রূপবোধ একেবারে বিলুপ্তির পথে। বিপুল অর্থ ও দীর্ঘদিনের আয়াসসাধ্য যে শিল্প, মন্দির, চৈত্য, প্রস্তর ও ধাতুর মূর্তি, সেগুলি আর তৈরী হয় না—কলালক্ষ্মীর শেষ পদলাঞ্ছন বহন করে বাঙলা শিল্পস্বকীয়তা বজায় রেখেছিল স্বল্পমূল্যের নিত্য ব্যবহার্য কাঁথা, পুতুল, সরা ইত্যাদির মধ্যে।

আধুনিককালে প্রত্নসম্পদ সংগ্রহ করে সাংস্কৃতিক ইতিহাস রচনা করবার চেষ্টা গত শতাব্দী থেকেই শুরু হয়েছিল। এরই ফলে কলিকাতার কেন্দ্রীয় কলাশালা, প্রদেশে প্রদেশে ছোট ছোট সংগ্রহালয় গড়ে উঠেছে।

কিন্তু কেবল সংগ্রহশালা করে আর তার সহায়তায় সাংস্কৃতিক ইতিহাস রচনা করলেই এই প্রত্নানুসন্ধিৎসার সিদ্ধি হচ্ছে না। এই কলাশালাগুলিকে সজীব করে তুলতে হবে, একেবারে জনসাধারণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগে সংযুক্ত করে। এইদিক থেকে আপনারা যে

পথনির্দেশ করেছেন তা অত্যন্ত যুগোপযোগী হয়েছে। এই সঙ্গে আপনারা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ চিত্রশালার সঙ্গেও যে যোগস্থাপন করেছেন তার ফলও সুদূরপ্রসারী হবে বলেই মনে করি।

আশুতোষ চিত্রশালা, চিত্রশালা গঠনের দিক থেকে একটা নূতন পথনির্দেশের প্রয়াস করেছে। বিভিন্ন অঞ্চলের আঞ্চলিক সংগ্রাহক-দের সহানুভূতিতে ও প্রচেষ্টায় এই চিত্রশালার সংগ্রহ যেমন একদিকে বঙ্গীয় শিল্পদ্রব্যাদি সম্বন্ধে প্রতিনিধিস্থানীয় হয়ে উঠেছে তেমনি ছাত্রদের ও জনসাধারণের সঙ্গে সংযোগেও একটা নূতন রীতির প্রবর্তন করেছে।

ঠিক এই উপায়েই স্থানীয় শিল্প সংগ্রহের সঙ্গে সঙ্গে গ্রামীণ কারু-শিল্পগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করুন, গ্রামীণ উৎসব-আনন্দগুলিকে ফিরিয়ে আনুন। 'অমূল্য প্রত্নশালা' গ্রাম পুনরুজ্জীবনের গবেষণার কেন্দ্র হয়ে উঠুক এই আমার আন্তরিক কামনা।

অমূল্য প্রত্নশালায় প্রদত্ত ভাষণ

নির্ঘণ্ট

চিত্র ১

বাঙলার ব্রতের আলপনায় বৃক্ষ ও পত্রের চিত্র (অবনীন্দ্রনাথ-কৃত 'বাংলার ব্রত' অনুসরণে)

চিত্র ২
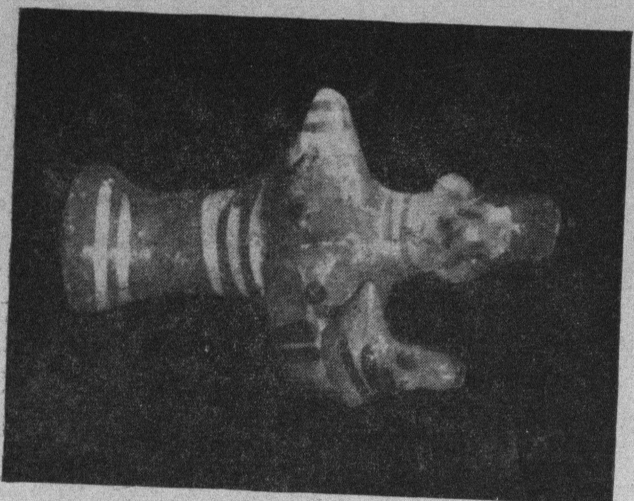
পক্ষীসদৃশ মুখাবয়ব বিশিষ্টা সন্তানক্রোড়ে মাতৃপুত্তলিকা মাটির উপরে বর্ণলেপনে ভূষিত, বাঙলার লোককলার নিদর্শন, সমকালীন।

চিত্র ৩

অলঙ্কার ও শিরোভূষণ সজ্জিতা নায়িকা, পোড়ামাটির মৃৎফলক, চন্দ্রকেতুগড়, চব্বিশ-পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ, খৃঃ পূঃ ১ম শতক

চিত্র ৪ চিত্র ৫

যক্ষিণী, পোড়ামাটির মৃৎফলক, চন্দ্রকেতুগড়, চব্বিশ-পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ, খৃঃ পূঃ ১ম শতক

যক্ষিণী মূর্তিকা, পোড়ামাটির মৃৎফলক, পোখরণা, বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ, খৃঃ পূঃ ৩য় শতক

চিত্র ৬

যক্ষিণী মূর্তিকা, পোড়ামাটির মৃৎফলক, চন্দ্রকেতুগড়, চব্বিশ-পরগণা,
খৃঃ পূঃ ১ম শতক

চিত্র ৭

চিত্র ৮

নৃত্যরত পুরুষমূর্তি, পোড়ামাটির মৃৎফলক, চন্দ্রকেতুগড়, চব্বিশ-পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ, খৃষ্টীয় ৪র্থ শতক

স্মিতহাস্যে উদ্ভাসিত নায়িকার মুখাবয়ব, পোড়ামাটির ভাস্কর্য, পান্না, মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, খৃঃ ৫ম শতক
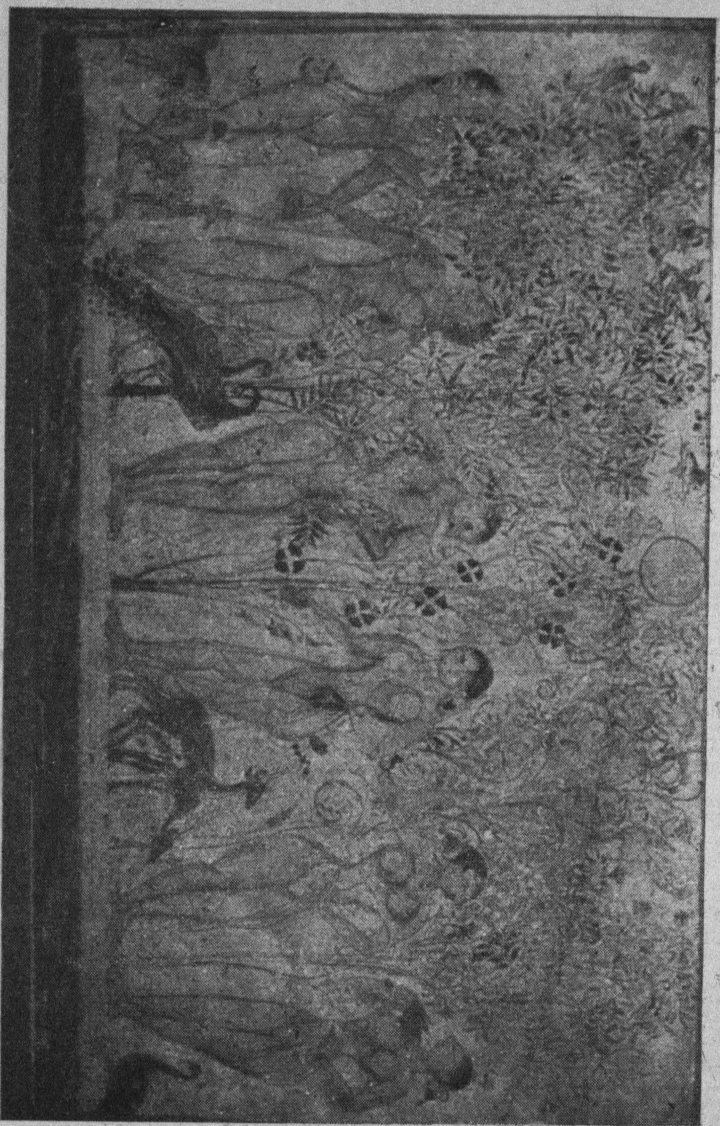
যমুনা তীরবর্তী চন্দ্রালোকিত কুঞ্জবনে গোপীদিগের কৃষ্ণানুসন্ধান, 'গীতগোবিন্দ', কাগজে অঙ্কিত
পুঁথির সূত্রপাত রেখাঙ্কনের নিদর্শন, নয়াগড়, উড়িষ্যা, খৃঃ ১৬শ শতক

চিত্র ১০

উড়িষ্যার নৃপতি মুকুন্দ হরিচন্দন (?) কর্তৃক আকবরের নিকট হইতে আগত দূতকে সাক্ষাৎকার প্রদান, কার্পাস বস্ত্রখণ্ড-সংলগ্ন কাগজে অঙ্কিত বর্ণাঢ্য চিত্র নিদর্শন, উড়িষ্যা, আনুমানিক খৃষ্টীয় ১৬শ শতকের মধ্যকালীন

চিত্র ১১

অশোকবনে রাম ও সীতার সাক্ষাৎকার, তুলসীদাস-কৃত 'রামচরিত মানস',
কাগজে অঙ্কিত হস্তলিখিত ও চিত্রিত পুঁথি, মহিষাদল,
মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, ১৭৭২ খৃস্টাব্দ

চিত্র ১২
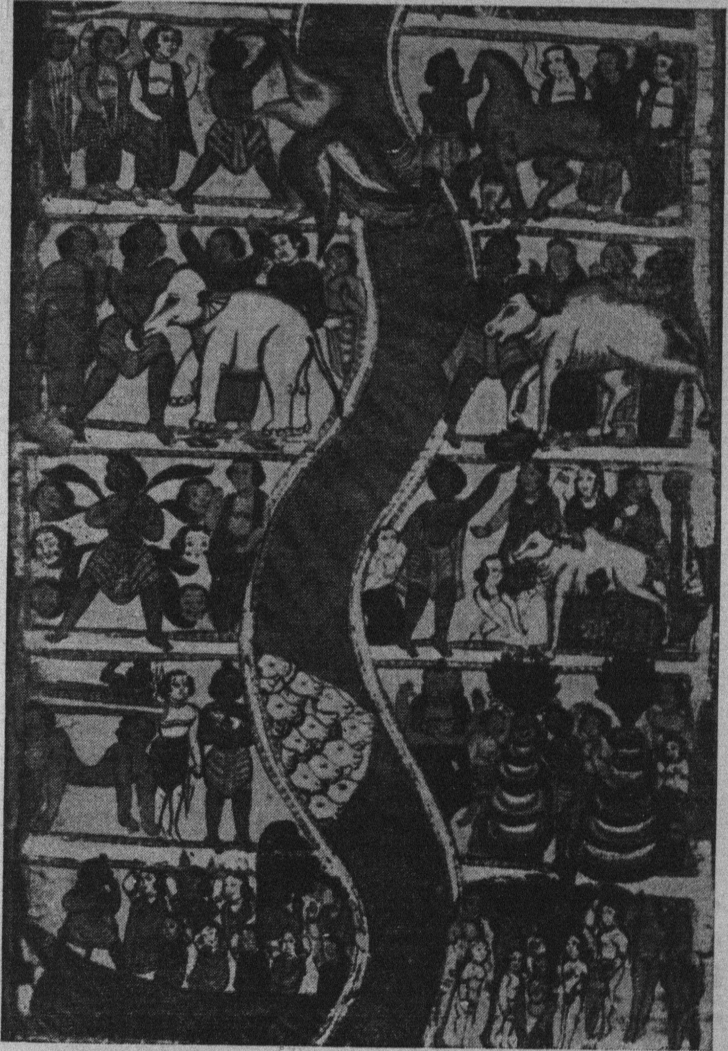
কৃষ্ণলীলা পট, কাগজে অঙ্কিত, মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, আনুমানিক
১৮শ শতকের প্রথমার্ধ

চিত্র ১৩
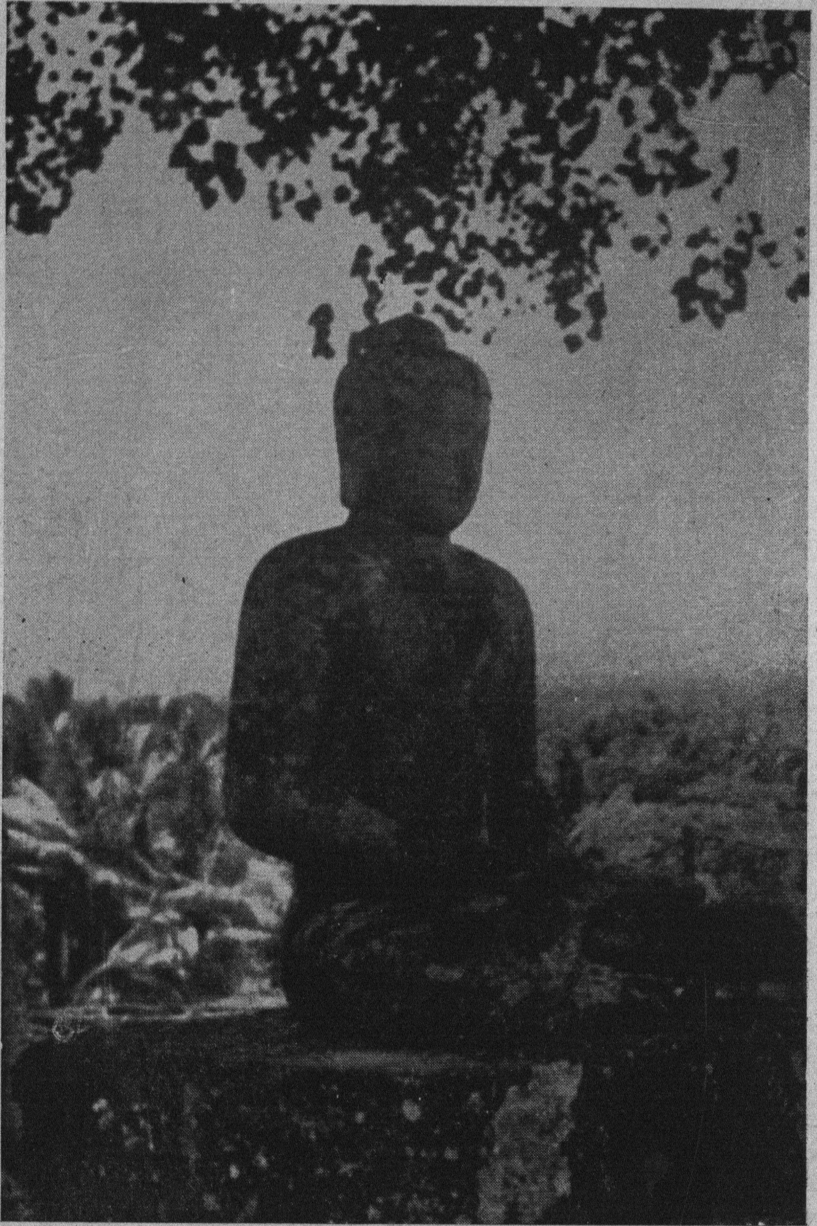
বোরোবুদুরের পাদমূলস্থিত একটি ধ্যানীবুদ্ধ, মধ্য-যবদ্বীপ, ইন্দোনেশিয়া, খৃষ্টীয় ৮ম শতক (লেখক কর্তৃক গৃহীত আলোকচিত্র, পূর্বে অপ্রকাশিত)